কল্যাণপুর গণহত্যা

আলী আকবর টাবী

১৯৭১
গণহত্যা ও নির্যাতন
আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ১৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
মুনতাসীর মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন সিদ্দিকী

প্রকাশকাল
চৈত্র ১৪২১/মার্চ ২০১৫

কল্যাণপুর গণহত্যা [Kallyanpur Genocide]

©
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
[1971 : Genocide-Torture Archive & Museum Trust]
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী
[Bangladesh History Congress]

প্রকাশক
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
৩৩৪ শের-এ-বাংলা রোড, ময়লাপোতা মোড়, খুলনা ৯১০০
itihassammilani.bd@gmail.com, archivemuseum1971@gmail.com
০১৮১৬২৮৮৬৭৪, ০১৭১৫৪৫৭৩৮২, ০১৭১১২১৭১১১

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ, ৬০/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থ নকশা ও প্রচ্ছদ
তারিক সুজাত

পরিবেশক
জার্নিম্যান বুকস্
সুবর্ণ

মূল্য : ১৭৫ টাকা

ISBN : 978-984-9160-3-0-4

দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড প্রদত্ত অনুদানের
সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন। একের অধিক মানুষ হত্যাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে গণহত্যা হিসেবে। নির্যাতনের অন্তর্গত শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করা। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনো একটি দেশে এতো অল্প সময়ে এতো হত্যাও হয়নি। যদিও আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন কিন্তু মনে হয় সংখ্যাটি তারও বেশি হবে। গণহত্যা, বধ্যভূমি, নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু গুরুত্ব ততোটা এর ওপর দেয়া হয়নি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা হয়েছিল তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে এখনও সেই গণহত্যার কথা ফিরে আসে। যে কারণে ইউরোপে ফ্যাসীবাদ আর নাজিবাদ জায়গা করে নিতে পারেনি। আমাদের এখানে তা হয়নি দেখে গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন এবং হত্যাকারীদের সমাজ ও রাজনীতিতে এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশে সামরিকবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আবারও শেকড় গেড়েছে।

এ দেশে গণহত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ থেকেই মূলত এসব বাহিনীতে গেছে কর্মিরা। সুখের বিষয়, এসব মানবতাবিরোধীদের বিচার শুরু হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে।

দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনকী নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে গড়ে ওঠেছে '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ।

এরই আলোকে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি পুস্তিকা লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হবে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। প্রতিবেদনধর্মী হলেও পুরো কাজটি গবেষণামূলক। উল্লেখ্য, গণহত্যায় সব শহীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রতিটি গণহত্যায় যে কজনের নাম পাওয়া গেছে শুধু তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থে অনেক আলোকচিত্র/শিল্পীদের চিত্রকর্মের প্রতিলিপি ব্যবহার করা হয়েছে, যা নেয়া হয়েছে অন্তর্জাল ও বিভিন্ন বই থেকে। মুক্তিযুদ্ধের ছবি যেহেতু জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয় সে জন্য কখনও কেউ আপত্তি তোলেননি। শিল্পী ও আলোকচিত্রিদের ঋণ আমরা স্বীকার করছি।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমি স্থলে সরেজমিনে গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে, গণহত্যা সংশ্লিষ্টজনের সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে– সেই অশ্রু-শোণিতের দিনগুলিকে অন্তরে অনুভব করে তবেই প্রণয়ন করেছেন এই ভাষ্য। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সেই গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে– এ ভরসা আমরা করি।

বর্তমান পুস্তিকা *কল্যাণপুর গণহত্যায়* ঢাকা মহানগরের মিরপুর থানার কল্যাণপুর এলাকার মানুষদের ওপর সংঘটিত গণহত্যা-নির্যাতনের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন লেখক ও গবেষক আলী আকবর টাবী। নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেও তিনি কল্যাণপুর গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। আমাদের এই প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে শুধু গৌরব নয়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধূর কাহিনী তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উঠে আসবে। এই বেদনা ও গৌরবের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শও তো তাই।

মুনতাসীর মামুন
গ্রন্থমালা সম্পাদক

ভূমিকা

মিরপুরে বিহারিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় এতটাই শক্ত ঘাঁটি গেড়েছিল যে, সমগ্র বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হলেও মিরপুর মুক্ত হয় ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি। মিরপুর মুক্ত করতে যেয়ে শতাধিক বাঙালি সেনা ও পুলিশ নিহত হয়েছিল।

মিরপুর ও মোহাম্মদপুর ছিল বিহারি অধ্যুষিত। ২৫ মার্চের পর বিহারিরা মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের বাঙালিদের উপর নানারকম অত্যাচার শুরু করে। তারা বাঙালিদের গরু, ছাগল মুরগী ধরে নিয়ে যেত। কখনও কখনও পাকিস্তানি সেনাদের সাথে নিয়ে এসে বাঙালি ছাত্র, যুবকদের ধরে নিয়ে যেতো। যাদের নিয়ে যেতো তারা আর ফিরে আসতো না। শুধু মিরপুর মোহাম্মদপুরের বাঙালি নয়, রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিকামী বাঙালিদের ধরে এনে মিরপুর-মোহাম্মদপুরের বধ্যভূমিগুলিতে হত্যা করতো।

কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে মিরপুর রোডে এখন যে কালভার্টটি আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানে একটি উঁচু ব্রিজ ছিল। ব্রিজের নিচে ছিল গভীর খাল। খালটি বুড়িগঙ্গা গিয়ে মিশেছিল। ২৫ মার্চে পর থেকে বাঙালি দালাল ও বিহারিরা পাকিস্তানি সেনাদের সাথে নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরাপরাধ বাঙালিদের ধরে এনে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে ব্রিজের উপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিত। তারপর মেশিনগান দিয়ে গুলি করে খালে ফেলে দিত। লাশগুলি পানিতে ভাসতে ভাসতে বুড়িগঙ্গায় মিলিয়ে যেতো।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু করলে বিহারিরা শ্যামলী রিং রোডের মাথায় একটি ত্রিকোণ আকৃতির সবুজ পতাকা উড়িয়ে দেয়। পতাকাটি সাদা রংয়ের চাঁদতারা খচিত ছিল। একটি বড় পাগলা ঘণ্টা পতাকাটির নিচে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। পাগলা ঘণ্টা বাজলে বিহারিরা চারদিক থেকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পতাকা তলে সমবেত হয়ে বাঙালি পাড়ায় হামলা করে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও লুটতরাজ করতো।

২৫ মার্চে কালো রাত্রির পর রটে যায় বিহারিরা যে-কোনো সময় কল্যাণপুর আক্রমণ করতে পারে। এভাবেই কল্যাণপুরবাসীর সামনে চলে আসে বিভীষিকাময় ২৮ এপ্রিল। সেদিন ভোরবেলা শ্যামলীর রিং রোডে পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে বিহারিরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকে। এর কিছুক্ষণ পরেই মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের বিহারিরা পাকিস্তানি সেনা ও কিছুসংখ্যক বাঙালি বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতায় কল্যাণপুর ঘিরে ফেলে এবং আদিম হিংস্রতায় বাঙালি

নিধনে মেতে উঠে। নারী-পুরুষ-শিশু কেউ তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তারা বাঙালিদের বাড়িঘরে ঢুকে এবং অলিগলিতে ধাওয়া করে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে নির্মম ও পৈশাচিকতভাবে হত্যা করতে থাকে। গণহত্যা চলাকালীন সময়ে কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ডে একটি ইপিআরটিসি (বর্তমান বিআরটিসি) বাস ও একটি প্রাইভেটকার বিহারিরা আটক করে ড্রাইভারসহ সকল যাত্রীদের জবাইয়ের পর ব্রিজের নিচে ফেলে দেয়। হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দুপুরে ঘাতকদল কল্যাণপুর ছাড়ার পর পথে পথে পড়েছিল সারি সারি নিরীহ বাঙালির লাশ। এসব মানুষ জানতে পারেনি কী অপরাধে কারা তাদের হত্যা করছে।

সেদিন তাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন তৎকালীন ডেইলি পাকিস্তান অবজারভারের প্রেস ম্যানেজার আহসান উল্লাহ চৌধুরী, এসিআই কোম্পানির কর্মকর্তা সিরাজুল হক চৌধুরী, ডাঃ মোহাম্মদ হাসেম, ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের কর্মকর্তা নেছার আহমেদ ভূঁইয়া, জুটবোর্ডের এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এ.আই.এ আলাউদ্দিন, ইউনাইটেড ব্যাংকের কর্মকর্তা এ.জেড.এম. জাকিরউদ্দিন ও কিশোর সাইফুদ্দিন খান বাবুসহ প্রায় তিন শতাধিক বাঙালি।

কল্যাণপুর গণহত্যার দিন আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কর্মীরা ঘাতকদের মূল টার্গেট ছিল। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ শেখ হায়দার আলীকে তারা তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল। কিন্তু তিনি ম্যানহোলের ভিতর পালিয়েছিলেন বলে ঘাতকেরা খুঁজে পায়নি।

এসিআই কর্মকর্তা সিরাজুল হক চৌধুরী কল্যাণপুরে যুবসমাজ ও ইপিআরটিসি (বর্তমান বিআরটিসি)-র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং সেন্টার খুলেছিলেন। তিনি অস্ত্র চালাতে জানতেন। ট্রেনিংয়ের জন্য তিনি দু'টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল যোগাড় করেছিলেন। প্রতিদিন বিকালে তিনি নিজেই সবাইকে ট্রেনিং দিতেন। কল্যাণপুর গণহত্যার দিন বিহারিরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

২৮ এপ্রিল কল্যাণপুর গণহত্যা দিবস হিসেবে পরিচিত হলেও এর বিস্তৃতি ছিল কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, পাইকপাড়া, পীরেরবাগ, আহম্মদনগর, শ্যামলী, টেকনিক্যাল, গাবতলী ও গৈদ্দার টেক পর্যন্ত। বিহারি অধ্যুষিত মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের মধ্যবর্তী এই অঞ্চলগুলো ছিল মূলত বাঙালিপাড়া।

কল্যাণপুর গণহত্যার ৪৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে। লেখক ২০১০ সাল থেকে কল্যাণপুর গণহত্যার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন। গণহত্যার সকল তথ্য এখনও উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব

হয়নি। ৪৫ বছর আগের সংঘটিত ঘটনার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা খুবই দুরূহ কাজ। তারপরও গণহত্যার তথ্যসংগ্রহের কাজ চলছে এবং চলবে। বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া।

কল্যাণপুরের গণহত্যাসহ মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সকল গণহত্যার জন্য দায়ী খুনি ও যুদ্ধাপরাধীদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। খুনিদের যদি বিচার না হয়, তবে আবার আমরা বর্বরতার যুগে ফিরে যাব। খুনি এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুধু তাদের শাস্তি কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নয়। যুদ্ধ বন্ধ এবং সভ্য সমাজে অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য।

বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারের একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে।

চৈত্র, ১৪২১ / মার্চ, ২০১৫

আলী আকবর টাবী
tabi_akbar@yahoo.com

ভৌগোলিক অবস্থান

ঢাকা মহানগরের কল্যাণপুর মিরপুর থানার অন্তর্গত এগারো নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। মিরপুর থানা হওয়ার আগে কল্যাণপুর তেজগাঁ থানার অধীন ছিল। এরও আগে এ অঞ্চলটি ছিল কেরাণীগঞ্জ থানার অধীন। কল্যাণপুরের উত্তরে আদাবর ও মোহাম্মদপুর। দক্ষিণে পাইকপাড়া। পশ্চিমে গাবতলী। পূর্বে শ্যামলী ও আগারগাঁও।

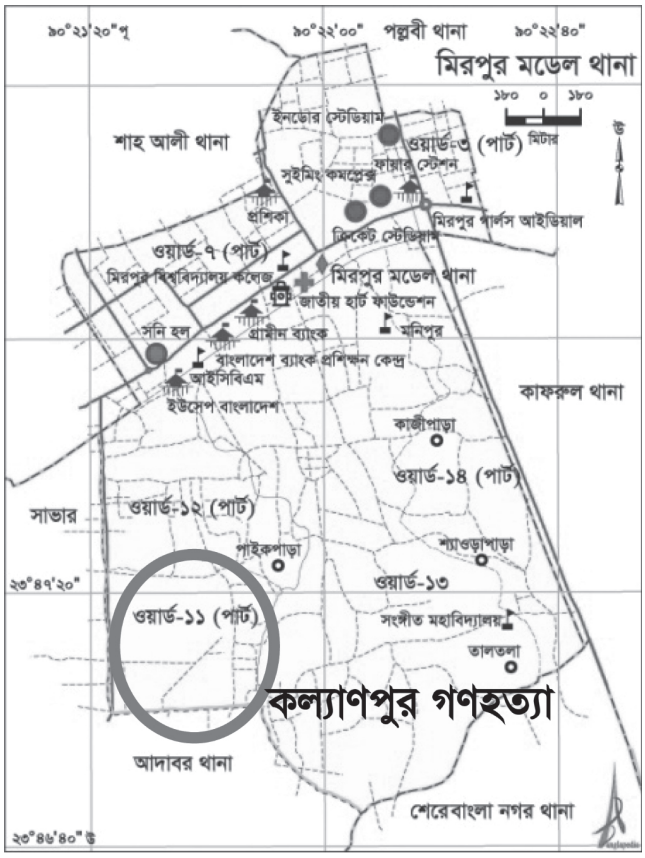

মিরপুর মডেল থানা *সৌজন্যে বাংলাপিডিয়া*

স্থানটির পারিপার্শ্বিক ও তৎকালীন অবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার উত্তরে মিরপুর ও মোহাম্মদপুর থানা ছিল বিহারি অধ্যুষিত জনপদ। কল্যাণপুর ছিল মিরপুর থানার অন্তর্গত বাঙালিপাড়া।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে কল্যাণপুরে বিআরটিসি (তৎকালীন ইপিআরটিসি) বাসডিপো, বাংলাদেশ বেতার (তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান) ভবন এবং হাউজিং এস্টেট এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও কল্যাণপুর তখনও শহর হিসেবে গড়ে উঠেনি। শহরের বৈশিষ্ট্য ও অবকাঠামো তখনও কল্যাণপুরের ছিল না। কল্যাণপুরের ভিতর তখনও কোনো পাকা রাস্তাঘাট গড়ে উঠেনি। ছিল কিছু মেঠোপথ। বাসডিপোর পাশ দিয়ে কল্যাণপুর মেইন রোডটি তখন সবে গড়ে উঠেছিল। তবে সেটি ছিল কাঁচা। সরকারিভাবে খাবার পানি সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। প্রতি বাড়িতেই টিউবওয়েল ছিল। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল না। শহরের কোনো সুবিধা না থাকলেও শেরে বাংলা নগরীকে 'সেকেন্ড ক্যাপিটেল' হিসেবে ঘোষণা দেবার ফলে কিছু শিক্ষিত চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী পরিবার বসতি নির্মাণ করে কল্যাণপুরে বসবাস শুরু করেছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের বেশির ভাগই ছিল কৃষিজীবী। বহিরাগতদের কিছু নবনির্মিত আবাসন ও স্থানীয়দের কিছু হাল্কা বসতি ছাড়া বাকি বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল কৃষিভূমি ও জলাশয়। স্থানীয়রা এসব ভূমিতে ধান, পাট ও ইক্ষু চাষ করতো। বর্ষাকালে নিচুভূমিগুলি প্লাবিত হয়ে যেতো। তখন মানুষ নৌকায় যাতায়াত করতো। সন্ধ্যা হলেই ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে আসতো আর শোনা যেতো শেয়াল-কুকুরের ডাক।

বাসডিপোর সামনে মিরপুর রোড এখনকার মতো এত প্রশস্ত ছিল না। বড়জোর ২৫-৩০ ফুট প্রশস্ত ছিল। রোডটি বেশ নিচু ছিল। বেশি বর্ষা হলে ডুবে যেতো। বর্ষায় কল্যাণপুরে মিরপুর রোডটি ডুবে গেলে গাবতলী ও মিরপুর ১ নম্বরের অধিবাসীরা নৌকায় কলেজ গেইট পর্যন্ত পারাপার হতো। বাংলা কলেজের সামনে টেকনিক্যাল থেকে মিরপুর ১ নম্বর রোডটি তখন নির্মিত হয়নি। মিরপুর ১২ নম্বর সেকশন থেকে টাউন সার্ভিসের বাসগুলো ছেড়ে মিরপুর ১ নম্বর, মাজার রোড, গাবতলী ও কল্যাণপুর হয়ে গুলিস্তান যেতো।

সে সময় উর্দুভাষী বিহারিদের দাপট এতটাই প্রবল ছিল যে মিরপুর-মোহাম্মদপুরের প্রবেশপথ আসাদ গেইট থেকেই বাঙালিরাও উর্দুতে কথা বলতে বাধ্য হতো। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সংসদ ভবন সংলগ্ন মিরপুর ও মোহাম্মদপুর থানাকে পাকিস্তানি ভাবধারায় গড়ে তোলার মহাপরিকল্পনা নিয়েছিল।

গণহত্যার পটভূমি

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিহারিদের পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা, ধর্মান্ধতা ও উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বিহারিদের ভিতর শক্ত অবস্থান গড়ে তোলে। বিহারিরাও বাঙালিদের স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার জন্য মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি গ্রহণ করে। যদিও বিহারিদের মধ্যে কিছু আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী-সমর্থক ছিল এবং কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। তবে তারা সংখ্যায় ছিল নিতান্তই নগ্য। আবার কিছুসংখ্যক বিহারি রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও মানবিক মূল্যবোধের কারণে বিপন্ন বাঙালিদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কল্যাণপুরেও স্থানীয় কিছু বিহারির সহযোগিতার কারণে অনেক বাঙালির জীবন রক্ষা পেয়েছিল।

'৭০-এর নির্বাচনে মিরপুর-মোহাম্মদপুর-তেজগাঁও এই তিন থানার সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আসনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম প্রার্থী মনোনীত হন। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রার্থী ছিলেন ডাঃ মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন উর্দুভাষী ছিলেন। কিন্তু ষাটের দশকের শেষ দিকে আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন।

বাঙালিরা আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে এবং বিহারিরা জামায়াত প্রার্থী গোলাম আযমের পক্ষালম্বন করে দুই বিপরীত মেরুতে বিভাজিত হয়ে পড়ে। গোলাম আযমকে বিজয়ী করার জন্য বিহারিরা সহিংস হয়ে উঠে। মিরপুর মোহাম্মদপুর বিহারি অধ্যুষিত এলাকা হওয়াতে গোলাম আযম সমর্থকদের ধারণা ছিল বাঙালিদের সামান্য কিছু ভোট টানতে পারলেই নির্বাচনে গোলাম আযম জয়ী হতে পারবেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল বাঙালিদের ভিতর জামায়াতীদের সমর্থন শূন্যের কোঠায়। নির্বাচনে গোলাম আযম বিপুল ভোটে পরাজিত হন এবং তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। পরাজিত হয়ে জামায়াত কর্মী-সমর্থক ও বিহারিরা প্রতিশোধ স্পৃহায় সহিংস ও বেপরোয়া হয়ে উঠে। প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ এসে যায় একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর। গোলাম আযম এবং তার দল

জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালি গণহত্যাকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে।

গোলাম আযম মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের ছাত্র সংঘের সভাপতি কাদের মোল্লাকে মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের দায়িত্ব প্রদান করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই কাদের মোল্লা ছাত্র সংঘ ও জামায়াত কর্মী এবং বিহারিদের সমন্বয়ে ঘাতক বাহিনী গড়ে তোলেন এবং বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধকে বানচাল করে দেবার জন্য গণহত্যা শুরু করেন। মিরপুর ও মোহাম্মপুরের বাঙালিপাড়াগুলোতে পরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমে আক্রমণ শুরু করে।

কাদের মোল্লার নীলনকশা অনুসারে জামায়াত ও ছাত্র সংঘের কর্মীদের সহায়তায় মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের বিহারিরা ১৯৭১ সালের ২৮ এপ্রিল ভোরবেলায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চারদিক থেকে কল্যাণপুরকে ঘিরে ফেলে অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞে নেতৃত্ব দেয় কাদের মোল্লার দক্ষিণ হস্ত হিসেবে পরিচিত বিহারি দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আক্তার গুণ্ডা।

ষাটের দশকে আক্তার নামে একজন বিহারি মিরপুরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনার মাধ্যমে সে মিরপুরে একটি বাহিনী গড়ে তুলে। মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনে তার কয়েকটি দোকান ঘর ছিল। সেগুলো সে ভাড়া দিতো। তবে তার আয়ের মূল উৎস ছিল চাঁদাবাজি।

'৬৯ সালে ভোটার লিস্ট বাংলায় বের হয়। বিহারিরা উর্দুতে ভোটার লিস্ট করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। বিহারিদের এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা বাঁধে। এই দাঙ্গায় আক্তার বাহিনী বাঙালিপাড়ায় ব্যাপক লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জামায়াত ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আক্তার বাহিনীকে ব্যবহার করে। মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনে বর্তমান প্রশিকার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় হজ্জ ফেরত হাজীদের নিয়ে একটি মাইক্রোবাস যশোরে যাচ্ছিল। আক্তার তার দলবল নিয়ে মাইক্রোবাসটি আটক করে এবং সব হাজীদের জবাই করে হত্যা করে। স্বাধীনতার পর সেই সব হাজীদের স্মরণে রাস্তাটির নামকরণ করা হয় হাজী রোড। এখনও এই নামেই রোডটি পরিচিত। এরকম অসংখ্য রোমহর্ষক ঘটনার নায়ক আক্তার গুণ্ডা।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

একাত্তরের ২৮ এপ্রিল ভোরবেলায় বিহারিরা 'নারায়ে তক্‌বির আল্লাহু আকবার' ও 'ইয়া আলী' প্রভৃতি ধর্মীয় ও জিহাদী শ্লোগান দিয়ে জেহাদি যোশে ছুরি, চাপাতি, বল্লম ও বন্দুক নিয়ে কল্যাণপুরে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের বিহারিরা বাঙালি পথচারী ও অফিস যাত্রীদের ধাওয়া করতে করতে কল্যাণপুর নিয়ে আসে। এসব বাঙালিরা বাঁচার আশায় কল্যাণপুরের ভিতর বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তারপরেও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। বিহারিরা বাড়ি বাড়ি ঢুকে আশ্রিত মানুষ ও বাড়ির বাসিন্দাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। বাঙালিদের কাঁচা ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাঁচার আশায় অগ্নিদগ্ধ বাড়ি থেকে যেসব মানুষ বের হয়ে আসে তাদের রাস্তার উপর ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করে। বিহারিদের এই আক্রমণ ছিল একতরফা। তাদের কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। কাপুরুষোচিত আচমকা সশস্ত্র এই আক্রমণ অপ্রস্তুত বাঙালিদের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

পাকিস্তানি সেনারা ২৫ মার্চের পর কল্যাণপুর রেডিও পাকিস্তান ভবনের সামনে ও বাংলা কলেজে বাঙ্কার নির্মাণ ও ক্যাম্প স্থাপন করে। বিহারিরা কল্যাণপুরে হামলা করলে এসব ঘাঁটির সেনারা মিরপুর রোডে অবস্থান নেয় এবং মাঝে মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করে বাঙালি হত্যায় বিহারিদের অনুপ্রাণিত করে। তবে পাকিস্তানি আর্মিরা কল্যাণপুরের ভিতর প্রবেশ করেনি। যে সব বাঙালি বাঁচার আশায় কল্যাণপুরের ভিতর থেকে মিরপুর রোডে উঠে পালানোর চেষ্টা করছিল তাদের ভিতর থেকে বেছে বেছে শতাধিক তরুণ এবং যুবকদের পাকিস্তানি সেনারা আটক করে ট্রাকে তুলেছিল।

মিরপুর ব্রিজ তখনও নির্মাণ হয়নি। বুড়িগঙ্গা নদীর উপর বর্তমান ব্রিজের পাশেই ছিল একটি সরু লোহার সেতু। কোনোরকমে একটি গাড়ি এই সেতুর উপর দিয়ে আসতে অথবা যেতে পারতো। লোহার সেতুর অস্তিত্বটি এখনো আছে। দুপুরের দিকে গণহত্যা শেষ হলে ট্রাকে আটককৃত হতভাগ্য বাঙালিদের মিরপুরের লোহার সেতুর উপর নিয়ে মেশিনগান দিয়ে ব্রাশফায়ার করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। বিহারিরা বেশ কিছু বাঙালিকে হাত-পা বেঁধে ঠেলাগাড়িতে করে মিরপুর ১০ নম্বর নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১০ নম্বর মৃত্যুপুরী থেকে বেঁচে আসা ডাঃ আনোয়ার উল্লা পাটোয়ারী সেখানকার রোমহর্ষক গণহত্যার বিবরণ দেন।

ডাঃ পাটোয়ারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেডিকেল কোরে চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধের আগে তিনি অবসর নিয়ে কল্যাণপুর জামে মসজিদের উল্টা পাশে একটি ফার্মেসি খুলে রোগীদের চিকিৎসা করতেন। সেনাবাহিনীতে চাকরির সুবাদে তিনি দীর্ঘদিন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার ফলে ভালো উর্দু বলতে পারতেন। গণহত্যার দিন প্রথমে তিনি কল্যাণপুর জামে মসজিদে লুকিয়ে ছিলেন। পরে স্থানটিকে নিরাপদ না ভেবে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলে বিহারিদের হাতে ধরা পড়েন। বিহারিরা তাকে হাত-পা বেঁধে ঠেলাগাড়িতে মিরপুর ১০ নম্বর নিয়ে যায়। সেখানে তার সামনে তিনজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রথমে দু'জন বিহারি দু'পাশ থেকে শক্ত করে ধৃত বাঙালি ব্যক্তিটির দুই বাহু পেঁচিয়ে ধরে। তারপর একজন বিহারি লম্বা একটি বর্শা নিয়ে দূর থেকে দৌড়ে এসে সজোরে বর্শার ফলাটি বুকের ভিতর ঢুকিয়ে পিঠ দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত। এই অভিনব পদ্ধতির নারকীয় গণহত্যা দেখে সমবেত ঘাতক দল উল্লাসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। পরপর এধরনের তিনটি গণহত্যা সংঘটিত হবার পর ডাঃ পাটোয়ারী উর্দুতে ঘাতকদের কাছে অনুনয় করে বলেন, তিনি একজন চিকিৎসক এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। একথা শোনার পর বিহারিরা তাকে ছেড়ে দিলে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। আরেকজন বাঙালি বিহারিদের নিষ্ঠুর গণহত্যা দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ডাঃ পাটোওয়ারীর সাথে এই বাঙালি ব্যক্তিটিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

কল্যাণপুর গণহত্যার পর অনেকের লাশ পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় তাদেরকে এই লোহার সেতু অথবা মিরপুর ১০ নম্বর এনে হত্যা করা হয়েছিল। বিহারিদের আক্রমণের শিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাড়ির হত্যাকাণ্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

রীতাভিলা

কল্যাণপুরের ১২ নম্বর রোডের ২ নম্বর বাড়িটির নাম রীতাভিলা। এই বাড়িতে ২৮ এপ্রিল সবচেয়ে নৃশংসতম গণহত্যাটি সংঘটিত হয়। বাড়িটি ছিল পাকা এবং দ্বিতল। কল্যাণপুর বিহারিদের দ্বারা আক্রান্ত হলে বাড়িটি পাকা হওয়ায় নিরাপদ ভেবে পাড়ার বেশকিছু লোকজন এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। এছাড়াও সেদিন সকালে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাঙালিরা ধাওয়া খেয়ে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাড়ির মালিক পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার প্রেস ম্যানেজার আহসান উল্লাহ চৌধুরী ছিলেন জনদরদী ও সজ্জন ব্যক্তি। সেদিন তিনি নিজের

জীবনের মায়া ত্যাগ করে অচেনা বিপন্ন মানুষদের জীবন রক্ষার জন্য আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু বিহারিদের হাত থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের জীবন রক্ষা করতে পারেননি। বিহারিদের হাতে তাঁকেও জীবন বলি দিতে হয়েছিল।

আহসান উল্লাহ চৌধুরীর বাড়ি (রীতাভিলা)
এ বাড়িতেই তিনিসহ ৩০ জনেরও বেশি লোককে জবাই করা হয়েছিল

বিহারিরা বাড়ির ভিতর লোকজনের অবস্থান টের পেয়ে দরজা ভেঙ্গে ভিতর প্রবেশ করে। তারা একে একে সবাইকে জবাই করে নিষ্ঠুরভাবে খুন করে। আহসান উল্লাহ চৌধুরীকেও স্ত্রী ও শিশু-কিশোর সন্তানদের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে।

কল্লোল

বর্তমান ১৩ নম্বর রোডের ৪ নম্বর বাড়িটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার ফজলুল হকের। বাড়িটির নাম 'কল্লোল'। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ২৫ মার্চ মধ্যে রাত থেকে 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে পৃথিবীর জঘন্যতম গণহত্যা শুরু করলে কল্লোল বাড়ির নারী ও শিশু-কিশোরসহ বেশিরভাগ সদস্যদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গণহত্যার দিন সেই বাড়িতে ফজলুল হকের বড় মেয়ের জামাই ডাঃ মোহাম্মদ হাসেম ও বড় মেয়ের সন্তান মোঃ আনসার এবং কুমিল্লা থেকে আগত আরেক মেয়ের সন্তান রেজাউল করিম শামীম অবস্থান করছিল। ফজলুল হকের এই দুই নাতির বয়স তখন ছিল ১৫-১৬ বছর। কল্যাণপুর গণহত্যার দিন দুই দফায় 'কল্লোল' বাড়িতে হামলা হলেও ফজলুল হকের দুই নাতি ঘাতকের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেঁচে যায়। কিন্তু মেয়ের জামাই ডাঃ মোঃ হাসেম জীবন রক্ষা করতে পারেননি। বিহারিরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁর লাশও পাওয়া যায়নি। ঘাতকেরা চলে যাবার পর ৫ জনের জবাই করা লাশ সারিবদ্ধভাবে বাড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

অশ্রুলেখা

বর্তমান ১১ নম্বর রোডের ২০ নম্বর বাড়িটি নাম 'অশ্রুলেখা'। বাড়িটির মালিক ছিলেন আব্দুস সোবাহান। মন্টু নামের তার এক ভাইও সেসময় এ বাড়িতে থাকতেন। ২৫ মার্চ রাত থেকে ঢাকায় নির্বিচারে বাঙালি হত্যা শুরু হলে গৃহকর্তা বাড়ির মায়া ত্যাগ করে সকল সদস্যদের নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় অন্যত্র চলে যান। ২৮ এপ্রিল হত্যাযজ্ঞ শুরু হলে বিহারিদের ধাওয়া খেয়ে কল্যাণপুর ও তার আশেপাশের লোকজন খালি বাড়ি পেয়ে 'অশ্রুলেখা'য় আশ্রয় নিয়ে কেউ দরজার ফাঁকে আবার কেউ খাটের নিচে লুকিয়ে থাকে। আক্রমণের এক পর্যায়ে খুনের নেশায় বিহারিরা বাড়িটির ভিতর প্রবেশ করে। দরজার ফাঁকে, খাটের নিচে এবং বাথরুমের ভিতর লুকিয়ে থাকা লোকদের ধরে নিয়ে বাড়িটির কাছে একটি নিচু জায়গায় নিয়ে পৈশাচিকভাবে একে একে সবাইকে হত্যা করে। বর্তমান ৭ নম্বর রোডের ১২/১ নম্বর বাড়ির আলাউদ্দিন খানের কিশোর পুত্র নাসিরউদ্দিন খান বাবু দরজার ফাঁকে লুকিয়েছিল। এমন সময় একজন বয়স্ক বিহারি কোন হ্যায় বলে ঘরে প্রবেশ করে এবং দরজার ফাঁকে বাবুকে দেখে পাইছি বলে আনন্দ হুংকার দিয়ে উঠে। কিশোর বলে খুনিরা তাকে রেহাই দেয়নি। তাকেও ঘর থেকে বের করে নিচু জায়গায় নিয়ে অন্যদের সাথে হত্যা করে।

খালেক দারোগার বাড়ি

৫ নম্বর রোডের ১১ নম্বর বাড়িটি মুক্তিযুদ্ধের সময় খালেক দারোগার বাড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল। কল্যাণপুর গণহত্যার দিন এই বাড়িটি কসাইখানায় পরিণত হয়। আক্রমণের সময় বাড়িতে কোনো সদস্য উপস্থিত ছিল না। তবে রাস্তাঘাটের ধাওয়া খাওয়া লোকজন এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এসব হতভাগ্য মানুষদের শেষ রক্ষা হয়নি। কসাইদের নির্মম আক্রমণে বলি হতে হয়েছিল এসব নিরীহ মানব সন্তানদের। গণহত্যার পরে এই বাড়িতে ৮-১০ জনের গলাকাটা লাশ পাওয়া যায়।

রুহুল আমিন চৌধুরীর বাড়ি

মুক্তিযুদ্ধের সময় রুহুল আমিন চৌধুরী ছিলেন ইপিআইডিসি-র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। পরবর্তীকালে তিনি যুগ্ম সচিব হিসেবে অবসর নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ২ নম্বর রোডের ১০ নম্বর বাড়ির মালিক। '৭১ সালের আগে থেকেই তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে এই বাড়িতে বসবাস করতেন। ২৫ মার্চ ক্র্যাকডাউনের পর তিনি পরিবারের সদস্য নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থানে চলে যান। বাড়ি পাহারার জন্য রেখে যান ভাতিজা টিপু, গাড়ির ড্রাইভার ও দাড়োয়ান আলীকে। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আইসিআইয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সিরাজুল হক চৌধুরী ঘাতকদের তাড়া খেয়ে আহত অবস্থায় রুহুল আমিন চৌধুরীর বাসায় আশ্রয় নেন। কিন্তু তারপরও তিনি রক্ষা পাননি। বিহারিরা তার পিছুপিছু ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়ে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মেয়েদের সাথে শেষবারের মতো দেখা করার জন্য বিহারিদের কাছে আকুতি প্রকাশ করে। কিন্তু তাতেও তাদের পাষণ্ড হৃদয় বিগলিত হয়নি। নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করা হয়। জবাই করে দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলা হয়। এরপর বাড়ির দারোয়ান আলীকে মেঝেতে ফেলে জবাই করে হত্যা করে।

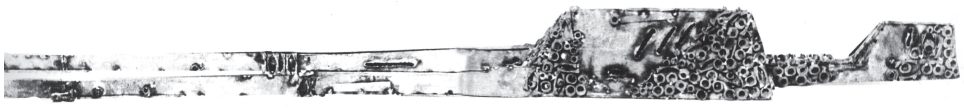

হামিদুজ্জামান খান
৭১-এর স্মরণে
ভাস্কর্য, ব্রোঞ্জ

শহীদ শনাক্তকরণ

কল্যাণপুর গণহত্যায় প্রায় তিন শতাধিক মানুষ শহীদ হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের প্রবীণদের অনেকেই আর বেঁচে নাই। যারা বেঁচে আছে তাদের স্মৃতিশক্তিও লোপ পেয়েছে। যেসব পরিবারের মেয়েদের সম্ভ্রমহানি ঘটেছিল স্বাধীনের পর লোকলজ্জার ভয়ে তারা আর ফিরে আসেনি। ৪৫ বছর আগে যারা ভাড়া থাকতো তাদের প্রায় সকলেই এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। স্থানীয় যেসব অধিবাসী কৃষি কাজে জড়িত ছিলেন কৃষিভূমির দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে তারা জমি বিক্রি করে চলে গেছেন এবং অন্যত্র কম দামে বেশি পরিমাণে কৃষি জমি ক্রয় করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এসব কারণে ৪৫ বছর আগে সংঘটিত কল্যাণপুর গণহত্যায় নিহত বেশিরভাগ শহীদদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

সেসময় কল্যাণপুর বাসডিপো হতে ইপিআরটিসি-র কিছু বাস ছেড়ে গুলিস্তান যেতো। তাই পীরেরবাগ, পাইকপাড়া, আহম্মদনগরসহ আশেপাশের এলাকার অধিবাসীরা বাসে চড়ার জন্য কল্যাণপুরের ভিতর দিয়ে বাসডিপোতে আসতো। সেদিনও আশেপাশের এলাকার অফিস যাত্রীরা কল্যাণপুরের ভিতর দিয়ে বাসডিপোতে যাবার সময় বিহারিদের আক্রমণের মুখে পড়ে এবং নিহত হয়। এসব হতভাগ্য বাঙালিদের নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

যেসব শহীদদের নাম উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল :

অশ্রুলেখা : কিশোর আবুবকর সাইফুদ্দিন খান বাবুসহ অনেককে
এই বাড়িতে বিহারিরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল

নাম	পিতার নাম	পেশা	ঠিকানা
আহসান উল্লাহ চৌধুরী	হামু মিয়া	প্রেস ম্যানেজার, ডেইলি পাকিস্তান অবজারভার	রীতা ভিলা, বাড়ি নং- ০২, রোড নং- ১২, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭
সিরাজুল হক চৌধুরী	ওয়াকিল চৌধুরী	এসিআই কোম্পানির কর্মকর্তা	মেলোডি হাউস, বাড়ি নং- ২, রোড নং- ১১, কল্যাণপুর, ঢাকা
এ.আই.এ. আলাউদ্দিন	দবির উদ্দিন	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, জুটবোর্ড	গ্রাম: সাকরাইল, উপজেলা: শিবালয়, জেলা: মানিকগঞ্জ
এ.ডে.এম. জাকির উদ্দিন	দবির উদ্দিন	ইউনাইটেড ব্যাংকের কর্মকর্তা	গ্রাম: সাকরাইল, উপজেলা: শিবালয়, জেলা: মানিকগঞ্জ
নেছার আহমেদ ভূঁইয়া	মরহুম আব্দুর রহমান ভূঁইয়া	উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার	ভূঁইয়া বাড়ি ৩৬, মধ্যপাইকপাড়া, ঢাকা- ১২১৬
সাইফুদ্দিন খান বাবু	আলাউদ্দিন খান	ছাত্র (দশম শ্রেণি, লালমাটিয়া বয়েজ স্কুল)	বাড়ি নং- ১২/১, রোড নম্বর- ০৭ কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭
আব্দুল আওয়াল	ফজলুর রহমান পাটোয়ারী	স্বত্ত্বাধিকারী, আজাদ ফ্রান্স স্টোর	ভূঁইয়া বাড়ি ৩৬, মধ্যপাইকপাড়া, ঢাকা- ১২১৬
মোশারফ হোসেন মণ্ডু	আব্দুল আওয়াল	স্বত্ত্বাধিকারী, আজাদ ফ্রান্স স্টোর	ভূঁইয়া বাড়ি ৩৬, মধ্যপাইকপাড়া, ঢাকা- ১২১৬
শামছুদ্দিন আহমেদ	মফিজুর রহমান হাওলাদার	ব্যবসায়ী	৭ নং কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭
ডাঃ মোহাম্মদ হাসেম	করিমুদ্দিন সরকার	চিকিৎসক	কল্লোল ভিলা, বাড়ি নং-৪, রোড নং-১৩, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭
মোহাম্মদ সিদ্দিক	মোঃ মিন্নত আলী	কৃষিজীবী	
আব্দুল হাকিম	আব্দুল হামিদ		১৬২, মধ্য পাইকপাড়া

নাম	পিতার নাম	পেশা	ঠিকানা
মোঃ আলী	জানা যায়নি	দিনমজুর	মধ্য পাইকপাড়া
তালেব আলী	মোহর আলী	দোকানদার	বাড়ি নং- ২৯/১, রোড নং- ১১, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭
নূরুজ্জামান (আহসান উল্লাহ চৌধুরীর কাজের ছেলে)	জানা যায়নি	গৃহকর্মী	
আহসান উল্লাহ চৌধুরীর কাজের ছেলে (নাম জানা যায়নি)	জানা যায়নি	গৃহকর্মী	
রহম আলীর মা		গৃহিণী	
করম আলী	ওমর আলী	গরু ব্যাপারী	বাড়ি নং- ২৯/১, রোড নং- ১১ কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭
নূরু মিঞা	জানা যায়নি	সড়ক ও জনপথ কর্মচারী	দক্ষিণ পাইকপাড়া, ঢাকা-১২১৬
নূরুল ইসলাম	আক্কেল আলী	রেডিও পাকিস্তানের কর্মচারী	২৯, কল্যাণপুর মেইন রোড, ঢাকা-১২০৭
চাঁন মিয়া	কালু মিয়া	জানা যায়নি	কল্যাণপুর (পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা পাওয়া যায়নি)
মোঃ কালু মিয়া	মোহাম্মদ আলী	জানা যায়নি	কল্যাণপুর (পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা পাওয়া যায়নি)
মোঃ মোকছেদ আলী	মৃত মোঃ আলাউদ্দিন	জানা যায়নি	৩২ নং কল্যাণপুর
আলী হোসেন	আলী একাব্বর	জানা যায়নি	২৫/১, কল্যাণপুর, রোড নং-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২০৭
আব্দুল আজিজ	কুদরত আলী	জানা যায়নি	কল্যাণপুর (পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা পাওয়া যায়নি)

কয়েকজন শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

কল্যাণপুর গণহত্যায় বেশকিছু শিক্ষিত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা শহীদ হয়েছিলেন। তাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত নিচে দেয়া হল :

আহসান উল্লাহ চৌধুরী

আহসান উল্লাহ চৌধুরী

শহীদ আহসান উল্লাহ চৌধুরী ১৯১৬ সালে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় মোহাম্মদনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হামু মিয়া এবং মাতার নাম আম্বিয়া খাতুন।

তিনি কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন মানিকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন এবং ফেনী কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক ও গ্র্যাজুয়েশন করেন।

গ্র্যাজুয়েশন লাভের পর তিনি কিছুদিন নিজ এলাকায় অবস্থিত দুধমুখা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে ঢাকার জনসন রোডে অবস্থিত তৎকালীন দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবুল হকের অধীনে সেলস্ ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। তিনি পূর্বদেশে কিছুদিন কাজ করার পর ডেইলি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় যোগদান করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ডেইলি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার প্রেস ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিবাহিত জীবনে তিনি পাঁচ ছেলে ও এক কন্যার জনক ছিলেন।

মুর্তজা বশীর
বাংলাদেশ ১৯৭১
কালি ও কলম, ১৯৭২

সিরাজুল হক চৌধুরী

সিরাজুল হক চৌধুরী ১৯১৮ সালের ২৪ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে। তার পিতার নাম ওয়াকিল চৌধুরী। পৈত্রিক বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত দিরাই উপজেলার সরমঙ্গল গ্রামে।

তিনি সুনামগঞ্জ সরকারি স্কুল হতে এন্ট্রান্স পাস করেন। পরবর্তীতে সুনামগঞ্জ এমসি কলেজ থেকে আই.এ. এবং গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভের পর তিনি ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে রয়ের নাভাল একাডেমিতে কমিশন র‍্যাঙ্কে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি রয়েল নাভাল একাডেমি ছেড়ে আসাম ট্রান্সপোর্ট, সিলং-এ চাকরি নেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ব্রিটিশ কোম্পানী আই.এস.আইয়ের কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে চাকরি নেন। তাঁর স্ত্রী রওশন সিরাজ তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের এবং পরে বাংলাদেশ বেতারের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। তিনি গীটার বাজাতেন।

১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকার কল্যাণপুরে বাড়ি নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ছিলেন। প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার সুবাদে তার সামরিক ট্রেনিং ছিল। তিনি ১৯৭১ সালে কল্যাণপুরের যুবকদের সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তাঁর নিজের লাইসেন্স করা অস্ত্র এবং আরো দুটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল যোগাড় করে তিনি যুবকদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন।

কল্যাণপুর গণহত্যার দিন বিহারিরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২৮ এপ্রিল রাতে স্বাধীন বাংলা বেতর কেন্দ্র এবং ২৯ এপ্রিল বিবিসি তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে। ২৯ এপ্রিল তাঁর আত্মীয়-স্বজন কল্যাণপুর থেকে তাঁর লাশ নিয়ে যায় এবং আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করে। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও তিন কন্যা রেখে যান।

শরণার্থী

আবু ইলিয়াস মোঃ আলাউদ্দিন

আবু ইলিয়াস মোঃ আলাউদ্দিন

শহীদ আবু ইলিয়াস মোঃ আলাউদ্দিন ২ অক্টোবর ১৯২০ সালে মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শিবালয় উপজেলার হুগলাকান্দি গ্রামে

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে হোগলাকান্দি গ্রামটি পদ্মার গর্ভে হারিয়ে গেছে। তিনি বাবা-মায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম দলিল উদ্দিন আহমেদ ও মাতার নাম কুলসুম খাতুন। তাঁর পিতা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বাবার চাকরির সুবাদে তাঁদের পরিবারকেও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়েছে। ভারতে থাকাকালীন সময়ে তিনি এন্ট্রান্স ও আই.এ. পাস করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলে তাঁদের পরিবার ঢাকায় চলে আসে এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হতে অনার্সসহ মাস্টার্স কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।

শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি পাকিস্তান সরকারের অধীনে জুট বোর্ডে চাকরি নেন। সততা ও যোগ্যতার কারণে তিনি দ্রুত পদোন্নতি লাভ করে জুট বোর্ডের উপ-পরিচালক পদে উন্নীত হন এবং ১৯৭১ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত ছিলেন। ২৮ এপ্রিল ভোরে তিনি ও তার ছোট ভাই জাকি উদ্দীন গাড়ি করে যাওয়ার পথে কল্যাণপুর সড়কে বিহারিদের হাতে ধরা পড়েন। তদেরকে বিহারিরা জবাই করে কল্যাণপুর ব্রিজের নিচে ফেলে দেয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান রেখে গেছেন।

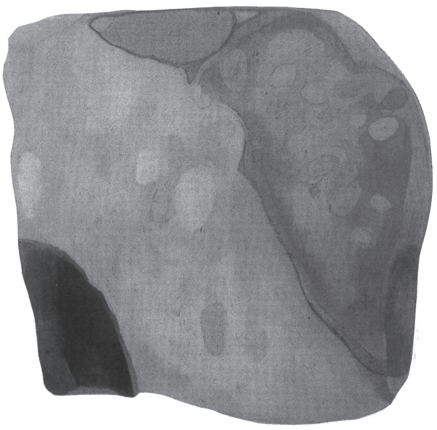

মুর্তজা বশার
শহীদ শিরোনাম
তেল রং, ১৯৭৩

আবু জাকির মোঃ জাকিউদ্দিন

আবু জাকির মোঃ জাকিউদ্দিন ১৯৩২ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শহীদ আবু ইলিয়াস মোঃ আলাউদ্দিনের সহোদর ও দলিল উদ্দিন আহমেদের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি জগন্নাথ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে আই.এ. ও গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।

আবু জাকির মোঃ জাকিউদ্দিন

এখানে উলেখ্য যে, তাঁর মেঝো ভাই আবু জায়েদ মোঃ জিয়াউদ্দিনও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তিনি চট্টগ্রামে একটি বহুজাতিক কোম্পানীতে সেলস্ এক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৫ মার্চের পর চট্টগ্রামের লালখান বাজারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়। জিয়াউদ্দিন প্রতিদিন সন্ধ্যায় লালখান বাজারের অসহায় পরিবারগুলোর জন্য গোপনে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিনি একটি গোপন প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এসব তৎপরতা জানার পর ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জিয়াউদ্দিনকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। তিনি আর কখনও ফিরে আসেননি।

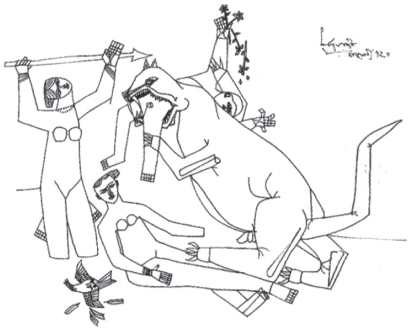

মুর্তজা বশীর
বাংলাদেশ ১৯৭১
কালি ও কলম, ১৯৭২

নেছার উদ্দিন আহম্মেদ ভূঁইয়া

শহীদ নেছার উদ্দিন আহম্মেদ ভূঁইয়া ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ সালে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত চাটখিল উপজেলার দক্ষিণ দেলিয়াই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আব্দুর রহমান ভূঁইয়া এবং মাতা মরহুমা জামিলা খাতুন। তিনি ১৯৪২ সালে নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুরের প্রতাপগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় হতে এন্ট্রান্স পাস করে বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন অধিদপ্তরে স্ট্যানোগ্রাফারের চাকরি নিয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। চাকরিতে থাকা অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তিনি আই.এ. পাস করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বদলি হন। ১৯৭০ সালে তিনি মধ্য পাইকপাড়ায় বাড়ি নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে যান।

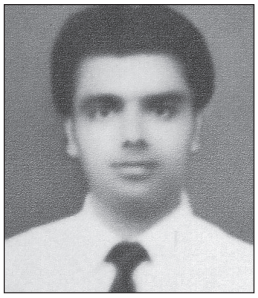

নেছার উদ্দিন আহম্মেদ ভূঁইয়া

নির্যাতিত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মৌখিক ভাষ্য

কালের গর্ভে কল্যাণপুর গণহত্যার ইতিহাস যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তখন কল্যাণপুর গণহত্যার ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য লেখক কল্যাণপুর অনুশীলন সংসদ ও উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, কল্যাণপুর শাখার সহযোগিতায় ২০১০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে গণহত্যার ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন। ৪৩ বছর আগের ইতিহাস খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। তিনি প্রবীণদের সহযোগিতা নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের খুঁজে বের করে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এখানে মোট ৮ জনের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হল।

শরণার্থী

আজিমুদ্দিন আহমদ চৌধুরী (৬১)

যুগ্ম সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পিতা: জালাল আহমদ চৌধুরী, বাড়ি নম্বর: ১, রোড নম্বর: ১২, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: কল্যাণপুরের নিজ বাড়ি, ২ জানুয়ারি ২০১০

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল পনেরো কী ষোল বছর। তখন আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। '৭১-এর ২৫ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক হত্যাযজ্ঞ শুরু হবার পর প্রতিটি বাঙালি প্রতিনিয়ত মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত থাকতো। ঢাকায় অবস্থানরত বেশির ভাগ বাঙালি পরিবার (যাদের পক্ষে সম্ভব) শিশু ও নারী সদস্যদের সম্ভাব্য নিরাপদ অবস্থানে সরিয়ে ফেলেছিল। আমার বাবা মরহুম জালাল আহমদ চৌধুরী, বড় ভাই মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও আমাকে ছাড়া বাকি সবাইকে বাবা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ২৫ মার্চের পর বিকেল ৫টা থেকে কারফিউ শুরু হয়ে যেতো। কাজেই সন্ধ্যার সাথে সাথে রাস্তাঘাট জনমানব শূন্য হয়ে পড়তো।

আজিমুদ্দিন আহমদ চৌধুরী

২৭ এপ্রিল রাতে চারদিক নিরব-নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে রাত্রির ভয়াল নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে মহাসড়ক থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর কনভয়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। রাত ৮টা কি ৯টার দিকে কল্যাণপুর ব্রিজের কাছ থেকে রাইফেলের গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। পরদিন ২৮ এপ্রিল ভোরবেলায় আমার বাবা অফিসে চলে গেলেন। আমি এবং আমার বড় ভাই বাড়িতে রয়ে গেলাম। সকাল সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে– হঠাৎ মিরপুরের দিক থেকে ভয়ার্ত মানুষের গগণবিদারী চিৎকার ভেসে এল। আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। বড় লাঠি, সুড়কি, তলোয়ার, কুড়াল, বল্লম, চাপাতি ও বন্দুক হাতে অসংখ্য অবাঙালি কল্যাণপুরের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। প্রথমে বুঝতে পারলাম না কি ঘটছে। পরে মিরপুরের দিক থেকে প্রাণভয়ে ছুটে আসা মানুষের কাছে জানতে পারলাম বিহারিরা বাঙালিদের বাড়িঘর বেপরোয়াভাবে লুটপাট করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। এইসব নরপিশাচেরা বাঙালিদের যাকে যেভাবে পাচ্ছে তাকেই গরু-ছাগলের মতো নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। এই নারকীয় তাণ্ডবে মৃত্যু পথযাত্রী নারী-পুরুষ-শিশুর ভয়ার্ত আত্মচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

খুনের নেশায় উন্মত্ত ঘাতক দল উর্দুতে বাঙালিদের খিস্তিখেউর করতে করতে উত্তরদিক থেকে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি চলে এল। আমরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঁচার জন্য প্রাণভয়ে কল্যাণপুরের দক্ষিণ দিকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম। ২নং রোডে গিয়ে রুশোদের বাড়িতে (২ নম্বর রোডের ১০ নম্বর বাড়ি) ঢুকে পড়লাম। সেখান থেকে বাবাকে ফোনে কল্যাণপুরের ঘটনার কথা জানিয়ে বের হতেই মোহাম্মদপুরের দিক থেকে শোরগোল শুনতে পেলাম।

বিহারিরা কল্যাণপুরে আমার অবস্থানের আরো কাছাকাছি চলে এল। মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য এদিকে সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। আমি বাঁচার জন্য আবার আমাদের বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলাম মিরপুর থেকে আগত বিহারিরা আমাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখার দিকে আমি অসহায় ও নির্বিকারভাবে চেয়ে রইলাম। একজন বিহারি আমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল– 'উ শালে বাঙ্গাল, ধর শালেকো, মার শালেকো!' আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে বারো নম্বর রোডে প্রফেসর আজিজুল ইসলাম চাচার 'ঠিকানা' নামের বাড়িতে ঢুকে গেলাম– যার বর্তমান হোল্ডিং নম্বর ০৪। বাড়িতে দেখলাম

কেউ নেই, দরজা-জানালা সব বন্ধ। শুধু বাইরের সার্ভেন্ট টয়লেটের দরজা খোলা। আমি তড়িৎ বেগে সার্ভেন্ট টয়লেটের ভেতরে লুকলাম। টয়লেটে দরজা আটকাতে যেয়ে দেখি ছিটকানি নেই। টয়লেটের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম– নরপিশাচেরা দল বেঁধে একেকটি বাড়িতে ঢুকেই মানুষ খুন ও লুটপাট করার পর বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। এরপর আবার আরেকটি বাড়িতে হানা দিচ্ছে। এভাবে হায়েনার দল একের পর এক ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে দিতে এক সময় আমি যে বাড়িতে লুকিয়েছিলাম সে বাড়িতে এসে হাজির হল। মনে মনে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলাম। সৌভাগ্যবশতঃ দুর্বৃত্তরা টয়লেটটি না দেখে বাড়ির আনাচে কানাচে খুঁজে কাউকে না পেয়ে পাশের বাড়িতে চলে গেল। পাশের বাড়িটি ছিল তৎকালীন ডেইলি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার প্রেস ম্যানেজার আহসান উল্লাহ চৌধুরীর। তিনি সম্পর্কে আমার দুলাভাই ছিলেন। ঐ বাড়িটি পাকা হওয়ায় আশেপাশের বহু বাঙালি ঐ বাড়িটিতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে এক সাথে অনেক বাঙালি পেয়ে খুনে মদমত্ত বিহারিরা আদিম হিংস্রতায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক সাথে অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশুর বাঁচার আকুতি ও বুকফাটা ক্রন্দনে হৃদয় বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হল। গগনবিদারী আর্তচিৎকার আর আহাজারির মাঝে কসাইখানার জবাই করা গরুর মতো মানুষের গোঙরানির শব্দ আমার কানে ভেসে আসতে লাগল। একটি গোঙরানো শেষ না হতেই আর একটি গোঙরানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এক সময় অনেকগুলো গোঙরানোর শব্দ এক সাথে শোনা যাচ্ছিল। বেশ দীর্ঘ সময় ধরে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলল।

বেলা বারোটার দিকে চারদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ বাংলায় ফিসফাস শব্দ কথা শুনতে পেলাম। ভীতসন্ত্রস্তভাবে দরজা খুলে বের হলাম। রহিম আমাকে দেখে চিৎকার দিয়ে বলল– আজিম বেঁচে আছে! রহিমের চিৎকারে বুঝতে পারলাম– এই বীভৎস গণহত্যার পর বেঁচে থাকাটাই বিস্ময়কর ব্যাপার। রহিম আরো বলল– 'মহিউদ্দিন ভাইকে (আমার বড় ভাই) ওরা জবাই করে ফেলেছে। এতক্ষণ নিজেকে বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত ছিলাম। এখন ভাইয়ের করুণ মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকে পাথর হয়ে গেলাম। চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ বুবুকে (আহসান উল্লাহ চৌধুরীর স্ত্রী)কে দেখে চমকে উঠলাম। তাঁর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। ক্রমাগত দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনি তিনটি শিশুপুত্র নিয়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে তাঁর উপর দিয়ে এক দুঃসহ তাণ্ডব বয়ে গেছে। পরে শুনেছি স্বামীকে বাঁচানোর জন্য তিনি প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমে ঘাতকেরা দুলাভাইয়ের মাথায় শাবল দিয়ে

প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। আঘাতে মাথার ঘিলু বের হয়ে গিয়েছিল। তারপরও বুবু দুলাভাইকে বাঁচানোর আশায় মাথায় পানি ঢালছিলেন। এমন সময় বিহারিরা দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে দুলাভাইকে আবার আঘাত করতে উদ্ধত হলে বুবু অনেক কাকুতি মিনতি করেও ঘাতকদের বিরত করতে পারেননি। ঘাতকেরা সজোরে চাপাতির কোপে দুলাভাইয়ের পাঁজর দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছিল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে বুবুর শরীর ভিজিয়ে দিয়েছিল।

বুবুর শিশুপুত্রদের বয়স ছিল নেহাতই কম। সম্ভবতঃ পবনের বয়স দশ বছর, নিপুর সাত বছর ও মিঠুর পাঁচ বছর। ওদের বাবার হত্যাকাণ্ডসহ অসংখ্য মানুষের লোমহর্ষক মৃত্যু সচক্ষে দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। ওদের করুণ বিবর্ণ ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। পবনকেও ওরা খুন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘাতকদের একজন বাধা দেয়াতে সে বেঁচে যায়। বুবুর রক্তে ভেজা শাড়িটি পরিবর্তন করার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু এমন সময় কেউ একজন খবর নিয়ে এল বিহারিরা এখনও বাঙালিদের এদিকে সেদিন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি আমাদের তাড়াতাড়ি সরে পরার পরামর্শ দিলেন।

আমরা উপস্থিত সবাই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কল্যাণপুর জামে মসজিদের দিকে ছুটলাম। মসজিদের সামনে আমাদের পাড়ার একজন পরিচিত যুবক বয়সী বিহারি নাপিতের সাথে দেখা হল। সে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। বিহারি নাপিতটি মসজিদের ভেতরে আমাদের বসে থাকার পরামর্শ দিল। মসজিদের ভেতর গিয়ে দেখি বহু মানুষ বাঁচার জন্য গাদাগাদি করে বসে আছে। বিহারিরা দল বেঁধে বাঙালির খোঁজে এদিকে দু'তিনবার এসেছিল। কিন্তু বিহারি নাপিতটি তাদের বলেছিল এদিকে কোনো বাঙালি নেই। পরে মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের সমস্ত ঘাতক বিহারিরা চলে গেলে বেলা ২টার দিকে নাপিতটি আমাদের মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতে বলে।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় রহম আলীর সাথে দেখা। রহম আলী বলল– "তোমার ভাই মহিউদ্দিন এখনো বেঁচে আছে। মরার আগে একবার পানি খাওয়াবে না?" কথাটা শুনে আমার মনের গভীরে হু হু করে উঠল। আমি রহম আলীকে নিয়ে ছুটলাম আমার বড় ভাইকে দেখার জন্য। আমার সিনিয়র চব্বিশ-পঁচিশ বছরের দু'জন যুবক ইসুফ ও মঞ্জুর আমাদের সঙ্গী হল। রহম আলী রুবেল ও পবনদের বাড়ির মাঝখানে খালি প্লটে আমাদের নিয়ে গেল। সেখানে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছেন আমার বড় ভাই মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী। আমার ভাই বাকপ্রতিবন্ধী ছিলেন। এমন একজন অসহায় তরুণ প্রতিবন্ধীর প্রতি সামান্যতম মানবিক আচরণ প্রদর্শন করেনি এসব হায়েনার দল। তাঁর নিষ্পাপ গলায় ছুরি চালাতে এসব নরঘাতকদের

একটুকুও হাত কাঁপেনি। এছাড়াও তাঁর দেহে ছিল পাঁচটি বল্লমের ঘা। তিনি দু'হাত দিয়ে পেটে বল্লমের তিনটি ক্ষতকে ধরে অসার হয়ে পড়েছিলেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য। তখনও তিনি মরেননি। আমার ভাইয়ের পাশে পবনের বাবা জনাব আহসান উল্লাহ চৌধুরীর লাশসহ আরো অনেক লাশ পড়েছিল। আমি মহিউদ্দিন ভাইকে ঢাকা মেডিকেলের নেবার জন্য গাড়ির খোঁজে কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ডে ছুটলাম। বাসস্ট্যান্ডে দেখলাম রেডক্রসের একটি এ্যাম্বুলেন্স এসে ডাক্তার হায়দার আলীকে খোঁজ করছে। ডাঃ হায়দার আলী একজন নামকরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগ করতেন। তিনি ছিলেন 'চয়নিকা' (৬৪, কল্যাণপুর প্রধান সড়কের, ঢাকা-১২০৭) বাড়ির বাসিন্দা নাসিমের দুলাভাই। সেদিন তিনি কল্যাণপুরেই ছিলেন। কিন্তু ঘাতকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি আহত মানুষদের হাসপাতালে নেবার জন্য ফোন করে কল্যাণপুরে এ্যাম্বুলেন্স আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। আহত মহিউদ্দিন ভাইকে হাসপাতালে নেবার জন্য এ্যাম্বুলেন্সের চালককে অনুরোধ করলাম। চালক বললেন, আমরা কল্যাণপুরের ভিতরে যাব না। আপনার ভাইকে বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে আসুন। তখন মহিউদ্দিন ভাইকে আনার জন্য বাসস্ট্যান্ডে অবস্থানরত মন্‌জু ও কয়েকজন সহৃদকে আমার সাথে যাওয়ার অনুরোধ করলাম। তারা আমার সঙ্গী হল। মহিউদ্দিন ভাইকে বাসস্ট্যান্ডে নেবার জন্য বাঁশ ও কাপড় আনার জন্য পবনদের বাসায় ঢুকলাম। ঢুকেই আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। ভয়ে সমস্ত শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল। এ যেন কারবালার প্রান্তর। চারদিকে লাশ আর লাশ। প্রতিটি রুমেই অনেক লাশ গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে। সার্ভেন্ট টয়লেটে লুকিয়ে থেকে আমি যে জবাই করা মানুষের গোঙরানি শুনেছিলাম এগুলো সেই সব মানুষের লাশ। সবগুলো রুম মিলে প্রায় তিরিশটি লাশ পড়েছিল। বেশিরভাগ লাশই গলাকাটা। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছিল। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। বাঁশ আর কাপড় আনা হল না। দ্রুত বের হয়ে এসে ধরাধরি করে মৃতপ্রায় মহিউদ্দিন ভাইকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে হাসপাতালে রওনা হলাম।

আহসান উল্লাহ চৌধুরী ছিলেন ডেইলি পাকিস্তান অবজারভারের মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর আত্মীয়। হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন পাকিস্তানের সমর্থক। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সাথে তার বিশেষ সখ্যতা ছিল। তাই হামিদুল হকের প্রচেষ্টায় পরদিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা একটি ট্রাক নিয়ে আহসান উল্লাহ চৌধুরীর লাশ নিতে কল্যাণপুর এসেছিল। পাকিস্তানি সেনাদের সেই ট্রাকের সাথে আহসান উল্লাহ চৌধুরীর ভাতিজা এ.টি.এম.

মনিরুল হক চৌধুরী (লিলু) এবং আরো দু'জন আত্মীয় যথাক্রমে মনির আহম্মদ চৌধুরী ও ডাঃ শেখ হায়দার আলী এসেছিলেন। কল্যাণপুর এসে বাড়ির বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়ে থাকা আহসান উল্লাহ চৌধুরীর লাশ সেনাবাহিনীর ট্রাকে তোলার পর কোনো আহত মানুষ বেঁচে আছে কিনা তা দেখার জন্য মনিরুল হক বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। একটা একটা করে লাশ পরীক্ষা করতে যেয়ে হঠাৎ তিনি দেখলেন একটি দেহ তখনো গরম আছে। তিনি এই আহত ব্যক্তিকে আহসান উল্লাহ চৌধুরীর লাশের সাথে নিতে চাইলে পাকিস্তানি আর্মিরা কিছুতেই রাজি হল না। তারা বললে, একটি লাশ নেবার পারমিশন আছে। তাই একটি লাশই নেয়া যাবে। কিন্তু উপস্থিত সকলের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত আহত ব্যক্তিকে নিতে তারা বাধ্য হয়। এই আহত ব্যক্তিটি ছিলেন 'চন্দ্রমা' (৭১, কল্যাণপুর প্রধান সড়ক, ঢাকা-১২০৭) বাড়ির বাসিন্দা ইসমাইল মিয়া। তিনি ছিলেন ডাঃ হাবিবুল্লাহর বাবা। দীর্ঘদিনের ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসায় আমার ভাই মহিউদ্দিন ও ডাঃ হাবিবুল্লাহর বাবা বেঁচে যান। ২৮ এপ্রিলের গণহত্যায় আহসান উল্লাহ চৌধুরীর বাড়িতে আহতদের ভেতর মাত্র এ দু'জনের জীবনই রক্ষা পেয়েছিল। চাপাতির কোপে ইসমাইল মিয়ার মাথায় গভীর ক্ষতের হয়েছিল। তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর ডান পাশটি চিরদিনের জন্য অবশ হয়ে যায়।

নির্যাতিত

হায়দর আলম চৌধুরী (স্বপন) (৫২)

প্রকৌশলী, ইবনেসীনা ট্রাস্ট, পিতা: আহসান উল্লাহ চৌধুরী, ঠিকানা: 'রীতা ভিলা', বাড়ি নম্বর: ২, রোড নম্বর: ১২। সাক্ষাতের স্থান ও তারিখ: কল্যাণপুরের পৈত্রিক বাড়ি, ১০ জানুয়ারি ২০১০।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ৭-৮ বছর। কলাবাগান লেক সার্কাস স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়তাম। কল্যাণপুর গণহত্যার

হায়দর আলম চৌধুরী (স্বপন)

দিন ভোরবেলায় আমাদের বাড়ির নিচতলায় বসেছিলাম। হঠাৎ বাড়ির বাইরে শোরগোল ও মানুষের দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। প্রতিবেশী কিছু লোকজন দৌড়ে আমাদের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। তারা বাবাকে বলল, বিহারিরা পাকিস্তানি আর্মিদের সাথে নিয়ে কল্যাণপুর আক্রমণ করেছে। বাঙালিদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। বাঙালি পেলেই হত্যা করছে। আমাদের বাড়িটি পাকা এবং দোতলা ছিল। তাই আশপাশের লোকজন নিরাপদ ভেবে আমাদের বাড়িতে জড়ো হতে লাগল। বাবা ছিলেন জনদরদী ও সমাজসেবক। তিনি সকলের জন্য আমাদের বাড়িটি উন্মুক্ত করে দিলেন। দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ির ভিতর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ভিতর থেকে বাড়ির মূল দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হল। সবাই মৃত্যু ভয়ে উৎকণ্ঠিত। অনেকে দোয়া দরুদ পড়ছিল। এমন সময় ঘাতকেরা দরজায় কড়া নাড়তে লাগল। পড়ি কি মরি বাড়ির ভিতর যে যেখানে পারল লুকাতে শুরু করল। আমিও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অন্দরমহলের একটা বেডরুমের খাটের নিচে লুকালাম। আমাদের সবগুলো রুম লোকজনে ঠাসা ছিল। শুধু অন্দরমহলের বেডরুমটি ফাঁকা ছিল। কিছুক্ষণ পর হৈহৈ রৈরৈ করে বিহারিরা লাঠিসোটা নিয়ে আমি যে রুমে লুকিয়েছিলাম সেরুমে ঢুকে পড়ল। তারা হাতুড়ি-শাবল দিয়ে আলমারী, বাক্স ভেঙে লুটপাট শুরু করল। আমি ভয়ে খাটের নিচে গুটিশুটি হয়ে রইলাম। লুটপাট শেষে বিহারিগুলো আমার রুম থেকে বের হয়ে গেল। আমিও খাটের নিচ থেকে বের হয়ে এলাম। এমন সময় কেউ একজন আমার পাঁচ-ছয় মাসের ছোট বোন রিতাকে এনে আমার কোলে দিয়ে গেল। এত লোকের হট্টগোল চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে সেও কাঁদছিল। আমি রিতাকে কোলে নিয়ে পাশের রুমে দৌড়ে ঢুকে গেলাম। রুমটা ভর্তি লোক। ১৫-২০ জনের কম হবে না। আমি ঢোকার সাথে সাথে কেউ একজন রুমের দরজা বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে বিহারিরা দরজায় আঘাত করতে লাগল। তারা দরজা ভাঙার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভাঙতে পারছিল না। আমি রুমে দৌড়ে ঢোকার সময় ওরা আমাকে দেখেছিল। তাই ওরা বলতে লাগল, 'এই খোকা দরজা খোল, তোমাকে আমরা কিছু বলব না।' কয়েকবার বলার পর আমি দরজা খুলে আমার ছোট বোনকে নিয়ে বের হয়ে আসলাম।

এত বাঙালি এক সাথে পেয়ে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল। হত্যাকে উৎসব ভেবে এসব নরপিশাচেরা রুমের ভিতরের অসহায় লোকগুলোকে আদিম হিংস্রতায় খুন করতে লাগল। চিৎকার, আহাজারি ও ক্রন্দনে এক বর্ণনাতীত হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হল। ঘাতকেরা কাউকে বর্ষা ও শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আবার কাউকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে আধমরা

করে মেঝেতে ফেলে পশুর মতো জবাই করতে লাগল। রক্তে আমাদের মেঝে ভেসে যাচ্ছিল। এসময় অন্যান্য রুম থেকেও ধস্তাধস্তি ও মৃত্যু চিৎকার ভেসে আসছিল। বোঝা যাচ্ছিল সেখানেও চলছিল হত্যার বিভৎস তাণ্ডব। এই ভীতিকর দৃশ্য দেখে আমি বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। কতক্ষণ আমি দাঁড়িয়েছিলাম বলতে পারব না। এক সময় সবগুলো রুমের মানুষের আর্তচিৎকার থেমে গেল। বোঝা গেল কোনো রুমেই আর জ্যান্ত মানুষ নেই। সবাইকে তারা খুন করে ফেলেছে। খুন করা শেষ হলে ঘাতকরা রক্তাক্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে বের হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তখনও বিভিন্ন রুম থেকে মানুষের গোঙরানোর শব্দ ভেসে আসছিল। ঘাতকরা একে একে সব বের হয়ে গেলে আমিও দুরু দুরু বক্ষে আমার বোনকে কোলে নিয়ে বাড়ির বাইরে বের হয়েই দেখি এক করুণ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য। আমার বাবা মাটিতে পড়ে গোঙরাচ্ছেন। কোনো কিছু দিয়ে তাঁর মাথা থেত্লে দেয়া হয়েছে। মাথা থেকে ঘিলু বের হয়ে গেছে। বাবার অদূরে পড়ে আছেন আমার মহিউদ্দিন মামা (জালাল নানার ছেলে)। সম্পর্কে তিনি আমার মামা হন। ওনার বয়স ২০-২২ হবে। আমাদের বাড়ির উল্টাপাশে ১২ নম্বর রোডের ১ নম্বর বাড়িটি মামাদের। মামার পেট কাটা। ওনাকে জবাই করা হয়েছে। উনিও গোঙরাচ্ছেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য!

বিহারিরা যখন দরজা ধাক্কাচ্ছিল তখন বাবা দরজা খুলে দিয়েছিলেন। বিপদ টের পেয়ে মা তখন বাবার পাশেই ছিলেন। দরজা খুলে দিয়ে বাবা বিহারিদের বলেছিলেন, 'তোমরা আমার বাসার যা আছে সব নিয়ে যাও। কিন্তু এসব নিরীহ মানুষকে মেরো না। মানুষ মারা ভালো না।' কথা শেষ না হতেই একজন বিহারি বাবার শার্টের কলার ধরে হিড়হিড় করে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল। আরেকজন বিশালাকৃতির শাবল দিয়ে বাবার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। আঘাতে বাবার মাথার ঘিলু ছিট্কে বের হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি মারা যাননি। প্রথম পর্যায়ের বাবার উপর যে হামলা হয়েছিল তা আমি সচক্ষে দেখিনি। পরে মায়ের কাছে তার বিবরণ শুনেছিলাম।

দ্বিতীয় পর্যায়ের হামলা আমি সচক্ষে দেখেছি। সে হামলার নির্মম স্মৃতি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। আমাদের বাড়ির সকল যুবক এবং বয়স্ক বাঙালিদের হত্যা নিশ্চিত করে বিহারিরা চলে যাবার পর মা আমাদের কাজের ছেলে নূরুজ্জামানকে পানি আনতে বললেন। নূরুজ্জামান পানি আনলে মা বাবার মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন। দূর থেকে কয়েকজন বিহারি মায়ের পানি ঢালার দৃশ্য দেখে আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ছুটে আসল। তারা বাবাকে আবার

আঘাত করতে উদ্দ্যত হল। মা তাদের হাতে-পায়ে ধরে বিরত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নরপিশাচদের হৃদয় কিছুতেই গলাতে পারলেন না। একজন ঘাতক গরু জবাইয়ের একটা ছুরির মাথা বাবার বাম পাঁজরে চাপ দিয়ে ধরে পুরো ছুরিটাই বুকের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। বাবার বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে মায়ের শাড়ি ও সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিল। বাবার বুকের ভিতর ছুরি ঢোকানোর নির্মম দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারি না।

এ সময় একজন বয়স্ক ব্যক্তি বিহারিদের ধাওয়া খেয়ে আমাদের সিঁড়ির কাছে লুকিয়েছিল। বর্তমান কল্যাণপুর গার্লস স্কুলের কাছে তাঁর একটি দোকান ছিল। বাবার বক্ষপিঞ্জরে ছুরি চালিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করার পর পরই ঘাতকেরা বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে ফেলল। ঘাতকদের কয়েকজন দৌড়ে যেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে ধরে এনে আমাদের বাড়ির সামনে উপুড় করে ফেলে দিল। তারপর দু'জন বিহারি একটা শাবলের দু'মাথা ধরে বৃদ্ধের ঘাড়ে এমনভাবে অভিনব কায়দায় সজোরে চাপ দিল যে, ঘাড়টি মট্ করে ভেঙে গেল। তারপর আরেকজন বড় একটা হাতুড়ি দিয়ে বৃদ্ধের মাথায় তীব্র আঘাত করল। আঘাতে মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধটি গোঙরাতে লাগল। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয়ে একটা ১৫-১৬ বছরের ছেলে আমাদের করিডোর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল। হঠাৎ করে তার লুঙ্গিটা খুলে গেল। বিহারিরা দৌড়ে মুরগী ধরার মতো ছেলেটিকে ধরে ফেলল। তারপর ছেলেটির পুরুষাঙ্গটি কেটে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। একটার পর একটা লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড দেখে মৃত্যু ভয়ে আমি কাঁপছিলাম। মনে হল ওরা যে-কোনো সময় আমাকেও মেরে ফেলবে। আমার বড় ভাই সারোয়ার আলম চৌধুরী পবন বাবার রক্তাক্ত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৩-১৪ বছর। এই সময় ১৭-১৮ বছরের কয়েকটি বিহারি ছেলে তাঁকে ছুরি মারতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের পাড়ার কয়েকজন বিহারি বয়স্ক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সে বেঁচে যায়। নূরুজ্জামানসহ আরো একজন কাজের ছেলে আমাদের ছিল। ওরা দু'জন এ সময়ে বাড়ির ভিতর পালিয়েছিল। ঘাতকরা বাড়ির ভিতর যেয়ে তাদেরকেও হত্যা করেছিল। আমাদের বাড়ির ভিতর এবং বাইরের সকল তরুণ, যুবক ও বয়স্ক বাঙালির মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘাতক বিহারিরা আবার খুনের নেশায় অন্যত্র ছুটল।

ঘাতক বিহারিরা চলে গেলে পাড়ার একজন পরিচিত বিহারি কসাই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। সে বলল, তোমাদের জন্য এ জায়গা নিরাপদ নয়। তোমরা আমার সাথে চল। সে আমাদের কল্যাণপুর জামে মসজিদে নিয়ে গেল। সেখানেও একজন পরিচিত বিহারি নাপিত ছিল। তারা দু'জনে মসজিদের ভিতর আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দিল।

মিরপুর এবং মোহাম্মদপুরের বিহারিরা তালা দেখে যেন মনে করে মসজিদের ভিতর কেউ নেই সেজন্য তারা এ ব্যবস্থাটি করেছিল। মসজিদের ভিতর ঢুকেই দেখি অসংখ্য মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমার ৫-৬ মাসের বোনটি যাতে কান্নাকাটি না করে সেজন্য দুধ দিয়ে শান্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কল্যাণপুরে ইপিআরটিসি (বর্তমান বিআরটিসি)র বাসডিপোর বহু বাঙালি ড্রাইভার, কন্টাক্টর ও কর্মচারীরা বিহারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কল্যাণপুর জামে মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিল। দুপুরের দিকে বিহারি নাপিতটি মসজিদের দরজার তালা খুলে দিয়ে জানাল বিহারিরা চলে গেছে। সে আমাদের সবাইকে দ্রুত সরে পড়ার পরামর্শ দিল। মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের বিহারিরা লুটতরাজ ও বাঙালি নিধনে অংশগ্রহণ করলেও কসাই ও নাপিতের মতো দু'একজন কল্যাণপুরের বিহারি আমাদের জীবন রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিল।

মসজিদ থেকে বের হয়ে বেশিরভাগ লোকজন কল্যাণপুর ইপিআরটিসি-র বাসডিপোর দিকে ছুটল। আমাদের পরিবারের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে ইপিআরটিসির কিছু কর্মচারী আমাদের বাসডিপোতে নিয়ে গেল। বাসডিপো থেকে ইপিআরটিসি-র কর্মচারীরা একটা বাস বের করে আমাদেরসহ উপস্থিত সব বাঙালিকে তুলে নিল। দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবার সময় বাসটিকে কিছু বিহারি ধাওয়া করেছিল। কিন্তু তারা বাসটি থামাতে সমর্থ হয়নি। ইপিআরটিসি-র বাসটি আমাদের মহাখালীর কাছাকাছি কোথায়ও এক জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিল। আমার মায়ের শরীরে তখনও বাবার রক্তমাখা শাড়িটি ছিল। এই অবস্থায় আমরা রিকসায় চড়ে মহাখালীর টিবি হাসপাতালের কলোনীতে মায়ের মামার বাসায় গেলাম। আমরা ক'টি ভাই বোন এবং মা যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমাদের কল্যাণপুরের গণহত্যার দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হবে।

ইদ্রিস আলী (৮৬)

পিতা: কদম আলী, ঠিকানা: গ্রাম- দক্ষিণ নারান্দিয়া, ডাকঘর- নারান্দিয়া, উপজেলা- দাউদকান্দি, জেলা: কুমিল্লা, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ- লেখকের বাড়ি (ঝিঙেফুল, ৬৭, কল্যাণপুর প্রধান সড়ক, ঢাকা- ১২০৭), ৭ মার্চ, ২০১০

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ৪৩ বছর। কল্যাণপুর সোবাহান সাহেবের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক (কেয়ারটেকার) হিসাবে কাজ করতাম। সোবাহান সাহেবের বাড়ির বর্তমান ঠিকানা: 'অশ্রুলেখা' বাড়ি নম্বর ২০, রোড নম্বর ১১। কল্যাণপুরে একটি মেসে আমি সিট ভাড়া করে থাকতাম।

২৭ এপ্রিল রাতে কল্যাণপুর বাসডিপোর সামনে মিরপুর মেইন রোডে থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল। পরদিন সকালে কল্যাণপুর বাসডিপোর সামনে গিয়ে দেখি মিরপুর ব্রিজের নিচে দু'টি ছাত্রের লাশ পড়ে আছে। লাশ দু'টির চোখ বাঁধা হাত দু'টি পিঠ মোড়া করে বাঁধা। লাশ দু'টি দেখার পর আমি বিষণ্ন মনে বাসডিপোর পাশে কল্যাণপুর মেইন রোড ধরে ধীরে ধীরে ঢুকেছিলাম। এমন সময় দেখলাম কল্যাণপুর ৩ নম্বর রোডের পাবনার আবুল সাহেব এবং ওনার বাবা, ছোট ভাই ও ড্রাইভার আমার পাশ দিয়ে মিরপুর মেইন রোডের উপর উঠলেন। হঠাৎ একদল সশস্ত্র বিহারি কোত্থেকে এসে আবুল সাহেবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন বিহারি ইট দিয়ে ড্রাইভারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। বিপদ বুঝে আমি ২ নম্বর রোডের কমোডর আবেদিন সাহেবের বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম। আবেদিন সাহেবের বাড়ির কাছে এসে দেখি কল্যাণপুর জামে মসজিদের ইমাম সাহেব ধান ক্ষেতে পালানোর জন্য দৌড়াচ্ছেন। আবেদিন সাহেবের বাড়ির পূর্ব দিকে তখন ধান ক্ষেত ছিল।

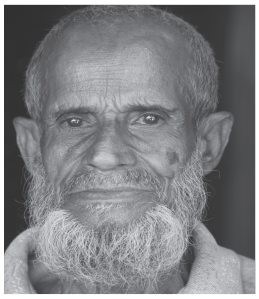

ইদ্রিস আলী

ইমাম সাহেবকে আমি থামালাম। বললাম আপনি হুজুর মানুষ তাই ধান ক্ষেতের চেয়ে বরং মসজিদ আপনার জন্য নিরাপদ। আমার কথায় ইমাম সাহেব মসজিদের দিকে রওনা হলেন। ইমাম সাহেবকে মসজিদের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি সোবাহান সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হলাম– যার বর্তমান ঠিকানা: 'অশ্রুলেখা' বাড়ি নম্বর ২০, রোড নম্বর ১১। সোবাহান সাহেবের এই বাড়িতে আমি বড় হয়েছি। ছোটকালে তিনি আমাকে বাড়ি দেখাশোনার জন্য নিয়ে এসেছিলেন এবং সন্তানের মতো স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে বড় করেছেন। সে কারণে ওনার বাড়ির প্রতিটি মানুষ ও জিনিসপত্রের প্রতি আমার অপরিসীম দরদ ছিল। তাই জীবনের মায়া ত্যাগ করে প্রথমে আমি ঐ বাড়ির মানুষ ও জিনিসপত্র রক্ষা করার জন্য ছুটলাম। 'অশ্রুলেখা' বাড়ির কাছে এসে দেখি রানার মা ওনার দু'টি ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওনার সাথে দু'টি সেলার

মুর্তজা বশীর
বাংলাদেশ ১৯৭১
কালি ও কলম, ১৯৭২

মেশিন ও কিছু বিছানাপত্র ছিল। আমি রানার মাকে বিছানাপত্র ও মেয়েদেরসহ একটি ভ্যানে তুলে দিলাম। এরপর ছুটে গেলাম 'অশ্রুলেখা' বাড়িতে। বাড়ির দরজা জানালা সব খোলা। ঘরের ভিতর কেউ নেই। ভয়ে সবাই পালিয়ে গেছে। আমি দ্রুত বিছানাপত্র বাঁধাছাদা করতে লাগলাম। চারদিকে মানুষের শোরগোল চলছিল। এরই মাঝে কয়েকটি গুলির শব্দ ভেসে এল। জানালা দিয়ে দেখলাম বহু লোককে বিহারিরা এদিকে ধাওয়া করে নিয়ে আসছে। ওমর আলীর ছোট ভাই তালেব আলীকেও দেখলাম বাঁচার জণ্য প্রাণপণে ছুটছে। পরিস্থিতি ভালোভাবে জানার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে তালেব আলীকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তালেব আলী বলল, বিহারিরা এদিকে আসছে। বাঁচতে চাইলে পালাও। আমিও তালেব আলীর সাথে দৌড়াতে লাগলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে তালেব আলী বলল, চল মুরগাকান্দায় যাই। এখানে মারা পড়লে মাটি দেবার কেউ থাকবে না। শিয়াল-কুকুর খেয়ে ফেলবে। আমরা ছুটতে ছুটতে ১১ নম্বর রোডের পশ্চিম মাথায় বর্তমান আমীর মাতবরের বাড়ির কাছে আসলাম। ১১ নম্বর রোডের মাথায় এসে দেখি এক বিহারি অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখেই চিৎকার দিয়ে বলল 'ধর শালাকো'। আমরা একটু পিছু হটলাম। ১১ নম্বর রোড থেকে গলির মতো একটি পথ ১২ নম্বর রোডের আহসান উল্লাহ চৌধুরী সাহেবের বাড়ির পিছনের দিকে যেয়ে শেষ হয়েছিল। এখন সে পথটি নেই। আমরা সে পথটি ধরে চৌধুরী সাহেবের বাড়ির পিছনে চলে গেলাম। চৌধুরী সাহেবের দোতলাটি তখন পুরো কম্‌প্লিট ছিল না। দু'তিনটা রুম ছিল।

আমরা দেয়াল টপকিয়ে কয়েকজন দোতলায় উঠে গেলাম। আমাদের দেখেই চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী বললেন, আপনারা এখানে এসেছেন। আপনাদের দেখলেই তো বিহারিরা আমাদের মেরে ফেলবে। আমাদের এদিকে আসতে দেখে বিহারিরা চৌধুরী সাহেবের বাড়িটি ঘিরে ফেলল। আমরা চৌধুরী সাহেবের বেডরুমের পাশে একটা রুমে লুকালাম। রুম ভর্তি লোক। আমি রফিকুল্লার বাবা (ইসমাইল মিয়া) আর তালেব আলী ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারলাম না। আমাদের পাশের রুমে আজিমের বোবা ভাইটি আশ্রয় নিয়েছিল। কয়েকজন বিহারি দোতলায় উঠে চৌধুরী সাহেবের বেড রুমে সজোরে কড়া নাড়তে থাকল। চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী নিরুপায় হয়ে দরজা খুলে দিলেন।

ওরা চৌধুরী সাহেবের স্ত্রীকে ডেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল। তারা চৌধুরী সাহেবের স্ত্রীকে চিৎকার করে বলল, তোমাকে মারব না। তোমার ছেলে মেয়ে আছে। তোমার স্বামীকেও কিছু বলব না। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে তোমার বাড়িতে বাঙালিরা কোথায় লুকিয়ে আছে।

আমি সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেলাম। ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তালেব আলী ভাইয়ের হাত ধরে বললাম, ভাই আমার ভয় করছে আমাকে ধরেন। শীত আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলাম না। হঠাৎ বুদ্ধি করে খাটের উপর থেকে লেপ নিয়ে সাড়া শরীরে পেঁচিয়ে রুমের এক পাশে পড়ে রইলাম। কোনো রকমে নাক জাগিয়ে নিঃশ্বাস নিতে থাকলাম। সারা শরীরে লেপ এমনভাবে পেঁচিয়েছিলাম যে বাহির থেকে বোঝার উপায় ছিল না ভিতরে কোনো মানব সন্তান আছে। লেপের ভিতর থেকে কোনো রকমে বাইরের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম। এমন সময় বিহারিরা দোতালায় উঠে আমাদের দরজায় লাথি মারতে লাগল। এক পর্যায়ে দরজা ভেঙ্গে গেল। কয়েকজন বিহারি রুমের ভিতর ঢুকেই তালেব আলীকে দেখেই হুঙ্কার দিয়ে বলল তুই ওমর আলীর ভাই তালেব আলী। শালা বাইন চোত তোকে রাখব না। বলেই কয়েকজন মিলে তালেব আলীকে এলোপাথাড়ি কোপাতে লাগল। এক পর্যায়ে তালেব আলী ভাইকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে গরুর মতো জবাই করে ফেলল। এ বিভৎস দৃশ্য দেখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান হারানোর পর রুমের বাকী সবাইকে কিভাবে খুন করেছে তা আমি আর দেখতে পারি নাই। সবাইকে খুন করার পর ঘাতকেরা লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লুটপাটের এক পর্যায়ে তারা আমার লেপ ধরে টানাটানি শুরু করল। লেপ ধরে টানাটানি করার সময় আমার আবার জ্ঞান ফিরে আসল। তারা ভেবেছিল লেপের ভিতর মূল্যবান জিনিসপত্র আছে। হ্যাচ্‌কা টানে তারা প্যাঁচানো লেপটি সম্পূর্ণ খুলে ফেলে আমাকে আবিষ্কার করল। আমাকে পেয়ে তাদের সে কি উল্লাস! হত্যার নেশায় হিংস্র দানবের মত তারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন বোগদা দা দিয়ে আমার পিঠে আঘাত করল। কয়েকজন ছুরি ও চাপাতি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকল। আমি চিৎকার করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু জপ্‌ করতে থাকলাম। একজন একটা দোনালা বন্দুক আমার পিঠে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিল। বন্দুকের ভিতর ছড়া গুলি ছিল। ছড়া গুলি আমার পিঠের বিভিন্ন স্থানে বিদ্ধ হয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে মেঝেতে পড়ে গেলাম। দম আটকিয়ে মরার মতো পড়ে চোখ মেলে রইলাম। একজন আমার মাথায় পারা দিল। কয়েকজন আমার দেহের বিভিন্ন অংশে বারি দিল। তারপরও আমি অতিকষ্টে মরার মতো ভান করে নিরব নিথর হয়ে পরে রইলাম। ওরা আমার অভিনয় বুঝতে না পেরে মৃত ভেবে চলে গেল। আমার দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণে মেঝে ভেসে যাচ্ছিল। তীব্র যন্ত্রণা ও শীতে শরীরে কাঁপন শুরু হল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। মরণ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি আপা আপা করে চৌধুরী সাহেবের স্ত্রীকে ডাকতে লাগলাম। উনি আসলে ওনার কাছে আমি পানি খেতে চাইলাম। উনি আমাকে পানি খেতে দিলেন। আমি ওনাকে বললাম, আপা

ওরা কি চলে গেছে। আপা বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমি তাহলে বাসায় চলে যাই। আপা বললেন, যাওয়ার শক্তি থাকলে যান। আমার লুঙ্গি রক্তে জমাট বেঁধে শরীরের সাথে লেগে গিয়েছিল। আমি লুঙ্গি খুলে উলঙ্গ হয়ে চৌধুরী সাহেবের বাড়ি হতে বের হয়ে রুবেলদের বাড়ির পিছনে কচু ক্ষেতের ভিতর কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর নিরাপদ মনে হলে অতিকষ্টে 'অশ্রুলেখা' বাড়িতে এসে পৌঁছালাম। 'অশ্রুলেখা' বাড়ির মালিক সোবাহান সাহেব বাসায় একজন পিয়ন রেখে গিয়েছিলেন। পিয়নটি আমার করুণ অবস্থা দেখে ধরাধরি করে কোনো রকমে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে লেপ দিয়ে ঢেকে দিল।

আমার এক বন্ধু ইপিআরটিসিতে চাকরি করতো। একই মেসে আমারা থাকতাম। তাকে খবর দিয়ে ডেকে আনা হল। আমার বন্ধু এসেই অভয় দিয়ে বলল চিন্তা করো না, তোমাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব। হাসপাতালে নেবার জন্য ওরা আরো কয়েকজনকে ডেকে আনল। তিন-চার জন আমাকে ধরাধরি করে ডিপোর কাছাকাছি নিয়ে যেতেই আর্মির গাড়ি এসে ডিপোর সামনে মেইন রোডে থামল। আর্মি দেখেই সবাই আমাকে রেখে পালিয়ে গেল।

একজন মহিলা বহুদিন যাবৎ কল্যাণপুর বাস করতো। যৌনকর্মী হিসেবে সবাই তাকে জানতো। সে ছিল ঢাকাইয়া কুট্টি অর্থাৎ ঢাকার আদি বাসিন্দা। 'ডাককুন্‌নি নামে' সে পরিচিত ছিল। এই মহিলাটি ছিল খুব সাহসী। স্বাধীনের পরে শুনেছি বহু বাঙালিকে সে পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। সে আমার কাছে এসে দেখল, আমি তখনও বেঁচে আছি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে একজন পাকিস্তানি সেনা কল্যাণপুর রেডিও বাংলাদেশের অফিসে ডিউটি করতো। ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে সে কল্যাণপুরে চায়ের দোকানে চা খেতে আসতো। সেই সুবাদে কল্যাণপুরের অনেক লোকের সাথে তার পরিচয় ছিল। আমার সাথেও তার পরিচয় ছিল। আমরা তাকে খান সাহেব বলে ডাকতাম। খান সাহেব তখন এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। যৌনকর্মী মহিলাটি খান সাহেবের কাছে যেয়ে বলল, খান সাহেব লোকটি এখনও বেঁচে আছে, ওকে বাঁচান। খান সাহেব তখন আমার দিকে এগিয়ে আসল। খান সাহেবকে আমি মিনতি করে বললাম, খান সাহেব আমার কেউ নেই, আমাকে বাঁচান। খান সাহেব বলল, মাত্ ঘাবড়াও। সে আমাকে রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে এনে ডিপোর কাছে একটা ঘরের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য আরেকজন লোককে দায়িত্ব দিল।

কিছুক্ষণ পর আরেকজন মারাত্মক আহত মৃতপ্রায় মানুষকে নিয়ে এসে আমার পাশে রাখা হল। মনে হচ্ছিল লোকটি রক্তে গোছল করে উঠেছে। ধারালো অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত তার শরীর।

ঘাতকরা মুখমণ্ডল থেত্লে দিয়েছে। বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। তারপরও তাকে আমি চিনতে পেরেছিলাম। সে ছিল কামুর ভগ্নিপতি। পাকিস্তানি আর্মিতে চাকরি করতো। বরিশালের উপকূলীয় অঞ্চলে তার বাড়ি ছিল। '৭০-এর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে তার ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছিল। তাই সেনাবাহিনী থেকে ছুটি নিয়ে সে বরিশালে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে দেশে মুক্তিযুদ্ধের হাওয়া লেগে যায়। কামুর ভগ্নিপতি সিদ্ধান্ত নিল সে আর সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবে না। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। আমার সাথে পরিচয় হবার পর তার এই স্বপ্নের কথা সে আমাকে বলেছিল।

দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করবে বলে যে পণ করেছিল তার এই করুণ পরিণতি কি করে হল জানতে চাইলাম। ক্ষীণ ও অস্ফুট কণ্ঠে সে ঘটনার বর্ণনা করতে লাগল। সে বলল, তার দু'নলা বন্দুক নিয়ে বিহারি ও রাজাকারদের সাথে সে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর তার গুলি শেষ হয়ে গেলে ঘাতকেরা তাকে ঘিরে ফেলে। বল্লম, ছুরি, চাপাতি ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে থাকে। এক সময় আমাকে মৃত ভেবে তারা চলে যায়।

সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছিল ততই আমাদের নরক যন্ত্রণা বেড়েই চলছিল। মনে হচ্ছিল আমরা হয়ত বাঁচব না। পাঁচটা কি ছয়টার সময় কল্যাণপুরে রেডক্রসের একটি এ্যাম্বুলেন্স আসলে খান সাহেবের পাহারাদারটি আমাদের এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিল। পথে রেডক্রসের এ্যাম্বুলেন্সটিকে বিহারিরা যাতে আক্রমণ করতে না পারে সে জন্য সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি গাবতলীর মিরপুর ব্রিজ পর্যন্ত পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেলছিলাম। কোথায় যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না। মিরপুর ব্রিজের কাছে এসে আবার জ্ঞান ফিরল। মনে হল আমরা যাব ঢাকা মেডিকেলে কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়? এ্যাম্বুলেন্সে বসা ব্রাদারকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা যাব ঢাকা মেডিকেলে কিন্তু আপনারা সাভারের দিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

উত্তরে কম্পাউন্ডার বলল আরপি সাহার নাম শুনেছেন? বললাম শুনেছি। ব্রাদার বলল সামনে ড্রাইভারের পাশে যিনি বসা, তিনিই আরপি, সাহা। টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ওনার একটি হাসপাতাল আছে। নাম কুমুদিনী হাসপাতাল। আপনাদের চিকিৎসার জন্য তাঁর হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিটি শেষ পর্যন্ত হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে জীবন রক্ষা করতে পারেননি। কল্যাণপুর গণহত্যার ৯ দিন পর (৭ মে) পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি।

রাত আটটার দিকে আমরা কুমুদিনী হাসপাতালে পৌঁছালাম। আমাদের চিকিৎসা শুরু হল। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আমাকে অজ্ঞান করা হল। পরদিন প্রায় সকাল আটটায় আমার জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফিরার পর দেখি আমার শরীরের ভিতর থেকে অপারেশন করে ছরা গুলিগুলো বের করে কাঁটা ও ক্ষত জায়গাগুলো সেলাই, ব্যান্ডেজ এবং প্লাস্টার করা হয়েছে। এসময় একটি দুঃসংবাদে মনটি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। শুনলাম আমার সাথে কামুর আহত যে ভগ্নিপতিটি এসেছিল তাকে বাঁচানো যায়নি। গত রাতেই সে মারা গেছে।

কুমুদিনী হাসপাতালের ডাক্তার নার্সদের আন্তরিকতার তুলনা হয় না। যে সেবা-যত্ন করে তারা আমাকে সারিয়ে তুলেছিল তা নিজের মাও করতো কি-না সন্দেহ আছে। প্রথম দিকে আমার নড়াচড়া করার কোনো শক্তি ছিল না। সমস্ত শরীরেই প্লাস্টার এবং ব্যান্ডেজ ছিল। নার্সরা কোলে মাথা তুলে মুখে ভাত তুলে খাইয়ে দিত। একজন রুগীকে সেবা দেবার জন্য দু'জন করে নার্স থাকতো। দু'একদিন পর আরপি সাহার মেয়ে হাসপাতালে রুগী দেখতে আসলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী খেতে ভালো লাগে। আমি ডাব খেতে চাইলাম। উনি লোক পাঠিয়ে নিজের গাছ থেকে ডাব পাড়িয়ে আনলেন। নিজে বসে থেকে ডাব খাওয়ালেন।

১০ দিন পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমার সমস্ত সেলাই কেটে ফেলল। ঐদিন রাতেই হাসপাতালের অদূরে এক মর্মান্তিক গণহত্যা সংঘটিত হল। হাসপাতালের কাছেই রাতের বেলায় আরপি সাহার গ্রামের বাড়িতে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা হামলা করল। সমস্ত গ্রাম পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দিল। হাসপাতাল থেকেই আগুনের লেলিহান শিখা ও মানুষের বুকফাঁটা আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম। রাতভর মেশিনগানের ব্রাশ আর রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনলাম। পরদিন সকালে অনেক আহত শিশু নারী পুরুষকে হাপাতালে নিয়ে আসা হল। আহতদের মুখে শুনলাম আরপি সাহা বাঙালিদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য শান্তি কমিটির লোকেরা পাকিস্তানি সেনাদের ডেকে এনে তাঁর বাড়ি এবং গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামের মানুষদের ধরে এনে নদীর পাড়ে তিন সারিতে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান দিয়ে ব্রাশ করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। আহতদের যখন ডাক্তার নার্সরা চিকিৎসা করতে ব্যস্ত তখন একদল রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যরা হাসপাতালে ঢুকে ত্রাস সৃষ্টি করল। তারা বলল এসব আহতদের গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দাও। তা না হলে আর্মিদের এনে বোমা মেরে হাসপাতাল উড়িয়ে দিব। এরা সবাই ছিল দাঁড়ি টুপি পড়া লোকজন। গ্রামের আহত লোকগুলো বলল এরা মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলাম করে। রাজাকারদের হুমকির মুখে যখন গ্রামের আহত লোকগুলোকে চিকিৎসা ছাড়াই জোর করে

হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তাদের ক্রন্দনে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল। কেউ চোখের জল ধরে রাখতে পারছিল না। কিন্তু আর্তনাদে পাষণ্ড মুসলিম লীগ ও জামায়াত নেতাকর্মীদের হৃদয় গলেনি। পরে শুনেছি আহতদের গ্রামে ফেরত নেবার পর পাকিস্তানি দালালদের প্ররোচণায় সেনাবাহিনী লোকেরা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল।

এসময়ে টাঙ্গাইলের কাছাকাছি কোথাও কাদেরিয়া বাহিনী সাথে যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আহত হয়েছিল। আহত পাকিস্তানি সৈনিকদের জন্য অনেক রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই পাকিস্তানি আর্মিরা সেদিন জোর করে কুমুদিনী হাসপাতালের ডাক্তার নার্স ওয়ার্ডবয় ও ছাত্রীদের রক্ত জোর করে নিয়েছিল। পাকিস্তানি আর্মি ও রাজাকারদের অত্যাচার এমন চরমে পৌঁছেছিল যে পরদিন সকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে মাইক যোগে ঘোষণা করল, আপনাদের যাদের শক্তি আছে তারা বাড়ি চলে যেতে পারেন। আমি কর্তৃপক্ষকে বললাম, আমি বাড়ি চলে যাব। কিন্তু আমার তো জামা কাপড় নাই। তখন কর্তৃপক্ষ মৃতদের কিছু জামা কাপড় এনে আমাকে দিল।

গেইটে দাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, ঢাকার কল্যাণপুরে যাচ্ছি। দাড়োয়ান বলল, আপনার সারা শরীর ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ও কাঁটাকুটা। বাসে রাজাকার কিংবা আর্মিরা দেখলে মুক্তিযোদ্ধা ভেবে মেরে ফেলবে। তার চেয়ে আপনি হাঁটা পথে ধামরাই চলে যান। আমি আপনাকে পথ চিনিয়ে দিচ্ছি। দাড়োয়ানের কথামত আমি মেঠোপথে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যায় ধামরাই পৌঁছালাম। দেখলাম ছেলেরা মাঠে বল খেলছে। আমার বিধ্বস্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে ছেলেরা খেলা ফেলে এগিয়ে এল। বলল দাদা আপনি কোথা থেকে এসেছেন, আপনার কী হয়েছে? আমি ছেলেদের সব কথা খুলে বললাম।

এরপর ওরা জিজ্ঞাসা করল এখন আপনি কোথায় যাবেন? আমি বললাম কল্যাণপুর যাব। ওরা বলল এ ভরসন্ধ্যায় আপনি তো কল্যাণপুর যেতে পারবেন না। আপনি বরং আমাদের সাথে চলুন। ওরা আমাকে এক বাড়িতে নিয়ে গেল। গোসল করার জন্য গরম পানি দিল। রাতে করলা ভাজি দিয়ে ভাত খেতে দিল। হাত দিয়ে ভাত খাওয়ার মতো অবস্থা আমার ছিল না। সেলাইয়ের জায়গায় রগে টান পড়তো। ওরা গালে তুলে আমাকে ভাত খাইয়ে দিল।

রাতে মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে ঘুমাতে দিল। সকালে আমাকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য ইমাম সাহেবকে তারা দায়িত্ব দিল। খুব ভোরে ইমাম সাহেব আমাকে নিয়ে ধামরাই শহরে

আসলেন। ধামরাই শহরে এসে দেখি শতশত পাকিস্তানি আর্মি মানিকগঞ্জ যাওয়ার জন্য ফেরিঘাটে অপেক্ষা করছে। আমি একটা বাসের কন্টাক্টরকে বললাম, আমি চানখারপুলে যাব, ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হব। কিন্তু আমার কাছে কোনো টাকা নাই। কন্টাক্টর বলল, চিন্তা করো না। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। কন্টাক্টর আমাকে চানখারপুলে নামিয়ে দিল। চানখারপুলে নেমে আমি সোজা ঢাকা মেডিকেলে গেলাম। সেখানে দুই-তিন মাস চিকিৎসা নিয়ে মোটামুটি সুস্থ হলাম। এখনও আমার সারা শরীরে ক্ষতবিক্ষত দাগ নিয়ে ২৮ এপ্রিলের দুঃসহ স্মৃতি বহন করে চলেছি।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান (জিন্নাহ্) (৫৬)

ব্যবসায়ী, পিতা: বজলুল হক, ঠিকানা: সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: 'ঝিঙেফুল', ৬৭, কল্যাণপুর প্রধান সড়ক, ঢাকা-১২০৭ (লেখকের বাড়ি), ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

মোহাম্মদপুর বয়েজ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম। ১৯৭১ সালের ২৮ এপ্রিল ছিল কল্যাণপুরবাসীর জন্য একটি বিভীষিকাময় দিন। সেদিন বাবা এবং আমরা দুই ভাই এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে কিভাবে জীবন রক্ষা করেছিলাম তা ভাবলে আজও শিহরিত হই।

তখন আমরা কল্যাণপুর বাতেন সাহেবের বোনের বাসায় ভাড়া থাকতাম– যার বর্তমান ঠিকানা: ৪১/১ কল্যাণপুর মেইন রোড, ঢাকা ১২০৭। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার কয়েকদিনের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। আমাদের একটা ছোট মারফিউ রেডিও ছিল। আমরা রাতের বেলায় আলো নিভিয়ে গোপনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতাম। আমাদের বাসার আশেপাশের মানুষও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনার জন্য রাতের অন্ধকারে আমাদের বাসায় আসতো। আমরা সবাই রেডিওর কাছে মাথা রেখে চুপিচুপি চরমপত্র, জল্লাদের দরবার ও খবর মজা করে শুনতাম।

আমার বাবা ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবরের উৎসাহী শ্রোতা। তখন রেডিও মাইক্রো ওয়েভে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধরা কঠিন ছিল। আমি ছোট হলেও রেডিও টিউনিংয়ে পারদর্শী ছিলাম। তাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধরার কঠিন দায়িত্বটি বাবা সচরাচর আমাকেই দিতেন। সেদিন ছিল ২৭ এপ্রিলের রাত। বাবার নির্দেশে আলো নিভিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খুললাম। সবাই অধীর আগ্রহে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছি। রাত তখন সাড়ে দশটা। কারফিউ শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কল্যাণপুর ব্রিজের কাছ থেকে দু'টি গুলির শব্দ ভেসে এল।

পরদিন সকাল সাতটার সময় বাবা সকালের নাস্তা কিনে দেবার জন্য আমাকে সাথে নিয়ে কল্যাণপুর বাসডিপোর সন্নিকটে মিরপুর মেইন রোডে নিয়ে গেলেন। মিরপুর মেইন রোডে গিয়েই দেখি বহু লোক কল্যাণপুর ব্রিজের উপর থেকে উঁকি দিয়ে নিচে কী যেন দেখছে। বাবা পাউরুটি কিনে দিয়ে অফিসে গেলেন। বাবা চলে যাবার পর আমিও কৌতূহল বশে ব্রিজের কাছে গেলাম। ব্রিজের নিচে উঁকি দিয়ে দেখলাম পেছনের দিকে হাতমোড়া বাঁধা দু'টি যুবকের লাশ অসহায়ভাবে পড়ে আছে। বয়স ২০-২১ বছর হবে। উপস্থিত অনেকেই বলাবলি করছিল– এরা দু'জনেই ছাত্র। একজনের পরণে ছিল কম্প্লিট স্যুট আরেকজন প্যান্ট-শার্ট। লাশগুলো তখনও তরতাজা। উপস্থিত জনতার ভিতর কয়েকজন একটি লাশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সন্তান হিসেবে শনাক্ত করেছিল।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান (জিন্নাহ)

বাসায় ফেরার কিছুক্ষণ পরেই বাবা হন্তদন্ত হয়ে অফিস থেকে বাসায় ফিরলেন। তাঁর চোখে মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। তিনি ছিলেন ইপিআরটিসির কল্যাণপুর বাসডিপোর স্টোর ইনচার্জ। তখন অনেক বিহারি কল্যাণপুর ডিপোতে চাকরি করতো। তাদের দু'একজন বাবাকে সমীহ করতো। তাদের মুখ থেকে বাবা জানতে পেরেছেন– যে-কোনো মুহূর্তে বিহারিরা কল্যাণপুর আক্রমণ করবে। তাই তিনি আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাসায় ছুটে এসেছেন। ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি নিধন শুরু হলে বাবা মাকে নিরাপদ দূরত্বে খালার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিলাম আমরা দু'ভাই। বাবা আমাদের দু'ভাইকে বিহারিদের সম্ভাব্য আক্রমণের কথা বললেন। তিনি আরো বললেন, এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতে আমরা বাইরে না পালিয়ে ঘরের ভিতরেই লুকিয়ে থাকব। মরলে তিনজন এক সাথে ঘরের মধ্যেই মরব। বাইরে পালালে সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। কে কোথায় মরে পড়ে থাকব তার

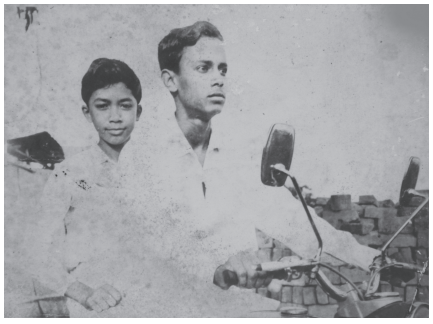

চালকের আসনে শহীদ নাসির উদ্দিন খান বাবু
পিছনে উপবিষ্ট জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার
রেজাউল করিম বাবুল

ঠিক নাই, শিয়াল-কুকুরের খাবারে পরিণত হব। এ সময় আমাদের বাসার পিছনের জানালা দিয়ে দেখলাম বাবু ভাই রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছেন। আমাদের বাসার পশ্চিমে কয়েকটা বাড়ির পরেই বাবু ভাইদের বাড়ি। বাবু ভাই ছিলেন আমার বড় মন্‌জু ভাইয়ের বন্ধু। তখন তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ১৫-১৬ বছর। হঠাৎ কী মনে করে তিনি দৌড়ে আমাদের জানালার কাছে এসে বললেন, জিন্নাহ, মন্‌জু তোরা তাড়াতাড়ি পালা। বিহারিরা কল্যাণপুরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। বাঙালি পেলেই হত্যা করছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। কথা শেষ হতে না হতেই তিনি আবার ভোঁ দৌড় দিলেন। বাবা বললেন বাবুকে থামা। ওকে আমাদের সাথে থাকতে বল। কিন্তু বাবু ভাইকে ডাকতে না ডাকতেই দৃশ্যের বাইরে চলে গেলেন। হায়! যে বাবু ভাই আমাদের বাঁচানোর জন্য এত আকুতি প্রকাশ করেছিলেন সেই বাবু ভাই-ই শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন রক্ষা করতে পারেননি। ২৮ এপ্রিল বিহারিদের হাতে তিনি নির্মমভাবে খুন হয়েছিলেন। তাঁর লাশটি পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছিল হট্টগোল ততই বাড়ছিল। আমরা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম রাস্তায় বহু লোক ছুটাছুটি করছে। বিশেষ করে কল্যাণপুর ডিপোর সামনে মিরপুর রোড থেকে লোকজন দৌড়ে কল্যাণপুরের ভিতর ঢুকে বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে। দেখতে দেখতে চতুর্দিক থেকে বিহারিরা কল্যাণপুরের ভিতর ঢুকতে লাগল। তারা সকলেই ছিল বল্লম, তলোয়ার, গরু জবেহ্‌র ছুরি ও চাপাতিসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। মানুষের আহাজারি আর আর্তচিৎকারে কল্যাণপুর যেন নরকপুরীতে পরিণত হয়েছিল। বিহারিরা বেপরোয়াভাবে বাঙালিদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। আশেপাশের বিভিন্ন বাড়ি হতে অগ্নি কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। চারদিকের লেলিহান শিখা দেখে আমাদের টিনের ঘরে থাকা আর নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। বাবাকে আমরা বললাম, ওরা যদি জোরে লাথি মারে তবে আমাদের দরজা ভেঙ্গে যাবে অথবা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলে সবাই পুড়ে মরব। তার চেয়ে চলেন আমরা কোনো পাকা বাড়িতে আশ্রয় নেই। বাবা আমাদের কথায় রাজি হলেন। বাবা ইতোপূর্বে বাড়িতে থাকার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা বাতিল করে পাশে অধ্যাপক মফিজুর রহমান স্যারের পাকা বাড়িতে আশ্রয় নেবার পরিকল্পনা নিলেন। মফিজ স্যারের বাড়িটির নাম 'ক্ষণিকা' (৪৫, কল্যাণপুর প্রধান সড়ক, ঢাকা-১২০৭)। মফিজুর রহমান স্যার ছিলেন জগন্নাথ কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক। পরবর্তীকালে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন।

আমরা ঘাতকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অধ্যাপক মফিজুর রহমানের বাড়িতে চলে আসি। স্যারের বাড়িতে এসে দেখি দরজা-জানালা সব বন্ধ। বাড়ির মধ্যে কোনো লোকজন আছে বলে মনে হল না। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি ঘর ভর্তি লোক। শ'দুয়েকের কম হবে না। ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এলাকার লোকজন স্যারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ভিতর থেকে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের শত ধাক্কাধাক্কিতেও ভিতর থেকে কেউ দরজা খুলল না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে আমরা স্যারের নির্মাণাধীন দোতলায় উঠলাম। সেখানে অনেক খালি সিমেন্টের ব্যাগ ছিল। বাবা আমাদের মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে সিমেন্টের খালি ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিলেন। বাবা নিজেও সিমেন্টের খালি ব্যাগের নিচে নিজেকে আড়াল করলেন। চারদিকে অগ্নিকুণ্ডলী আর মানুষের ভয়ার্ত আর্তচিৎকারে মনে হল যেন এক প্রেতপুরীতে এসে পড়েছি। ভয়ে শরীর হিম হয়ে আসতে লাগল। বুকের ভিতর ধরপড়ানি বেড়ে যেতে লাগল। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে লাগলাম। মনে হল এই বুঝি ঘাতকের দল এসে পড়ল। মাঝে মাঝে বাইরের অবস্থা বোঝার জন্য ব্যাগের নিচ থেকে মাথা বের করে উঁকি মেরে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। দেখলাম বিহারি এবং ঘাতকের দল মাথায় লালপট্টি বেঁধে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হন্য হয়ে বাঙালি খুঁজছে। কারো কারো ধারালো অস্ত্র থেকে মানুষের খুন ঝরছে। মাঝে মাঝে চিৎকার ভেসে আসছিল, 'উজ্‌কো পাকড়াও, উজ্‌কো কতল কোর দাও।' কিছু লোক আবার কেরোসিনের টিন নিয়ে দৌড়াচ্ছিল। এসব টিন থেকে কেরোসিন ঢেলে বাঙালিদের বাড়ি ঘরে আগুন দিচ্ছিল। মফিজ স্যারের বাড়ির পাশে দু'টি টিনের ঘর ছিল। হঠাৎ দেখি এই ঘর দু'টিতেও ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নিমিষেই আগুনের লেলিহান শিখা বাড়িটিকে গ্রাস করে ফেলল। তারা আমাদের এত কাছাকছি এসে পড়েছিল যে মনে হল আমরা আর বাঁচব না। মৃত্যু ভয়ে আমরা জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিলাম। বাবা আমাদের সাহস দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ আল্লাহ্ করো। ইন্‌শাল্লাহ্ কিছু হবে না। এ সময় দেখলাম বিহারিরা দল বেঁধে মফিজ স্যারের বাড়ির পাশ দিয়ে এনামুলদের বাড়ির দিকে চলে গেল। তখন মন্‌জু ভাই বললেন, বাবা চলেন এই সুযোগে আমরা এখান থেকে পালাই। বাবা বললেন কোথায় পালাবি? কোথাও তো নিরাপদ নয়। বরং এটা পাকা বাড়ি, এখানে থাকাই ভালো। কিন্তু মন্‌জু ভাই মৃত্যু ভয়ে এতটাই ধৈর্যহারা হয়ে উঠেছিলেন যে বাবার কথায় কর্ণপাত করলেন না। বিল্ডিংয়ের পিছনে কনস্ট্রাক্‌শনের জন্য যে বাঁশ বাঁধা ছিল সেটা বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। নিচে নেমেই এক বিহারিকে বাঙালি ভেবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কোনো বিহারি আছে কি-না। আমরা উপর থেকে সব দেখছিলাম। বিহারিটা কি মনে করে বলল, 'ভাগ যাও।' মন্‌জু ভাই বিপদ টের পেয়ে রুদ্ধশ্বাসে

মসজিদের দিকে দৌড় দিলেন। তিনি চোখের পলকে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আল্লার অশেষ মেহেরবানি সেদিন বিহারিরা আশেপাশে ঘোরফেরা করলেও আমাদের আশ্রিত বাড়িতে ঢোকে নাই। ২০-২৫ মিনিট পর বিহারিরা আমাদের এদিক থেকে সরে পড়ল। বাবা আমাকে নিয়ে 'ক্ষণিকা' বাড়ির দো'তালা থেকে নিচে নামলেন।

নিচে নেমেই মশুর বাবার সাথে দেখা। মশুর পুরা নাম মোশারফ হোসেন। মশু এবং মশুর বাবা মিলে কল্যাণপুর মেইন রোডে বর্তমান সজিব স্টুডিওর কাছে একটা বড় মনোহারির দোকান চালাতো। দোকানটির নাম ছিল আজাদ ফ্রান্স স্টোর। মশুর বাবার নাম আব্দুল আওয়াল। মশুর পুরো নাম ছিল মোশারফ হোসেন মশু। মশুদের দোকান থেকে আমরা বাকি নিতাম। বিহারিদের অপারেশনের সময় তিনি কোথাও লুকিয়ে ছিলেন। এখন হন্তদন্ত হয়ে পাইকপাড়ার দিকে ছুটছেন। ওনাকে থামানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু উনি না থেমেই বললেন, আমি পাইকপাড়া যাচ্ছি। সেখানে আমার জামাই আর ছেলে (মশু) আছে। দেখি ওদের কি অবস্থা। ওনার জামাই 'ভূঁইয়া সাহেব' হিসাবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। ভূঁইয়া সাহেবের পুরো নাম নেছার আহমেদ ভূঁইয়া। পাইকপাড়ার ভূঁইয়া বাড়িটি ওনার। বাড়িটির বর্তমান ঠিকানা ৩৬, মধ্যে পাইকপাড়া, ঢাকা-১২১৬। পরে শুনেছি মশুর বাবা পাইকপাড়া পর্যন্ত যেতে পারেননি। পথেই বিহারিরা ওনাকে খুন করেছিল। ওনার জামাই (ভূঁইয়া সাহেব) ও ছেলে মশুকেও সেদিন নির্মমভাবে খুন করা হয়েছিল। মশুর বাবা এবং ভূঁইয়া সাহেবের লাশ পাওয়া যায় নাই। স্বাধীন হওয়ার পর মশুর বোন (ভূঁইয়া সাহেবের স্ত্রী)-এর কাছ থেকে শুনেছি বিহারিদের তাণ্ডবের কয়েকদিন পর ওনারা বাসায় এসে মশুর ক্ষতবিক্ষত লাশ পেয়েছিলেন। তবে শিয়াল-কুকুর মিলে ততদিনে লাশের মাথা ও পাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলেছিল।

ভূঁইয়া সাহেবের ছেলেরা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও ওনার স্ত্রী ভূঁইয়া সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে পুরনো টিনের ঘর এখনও পাকা করেননি।

বাবা আমাদের দু'ভাইকে নিয়ে কল্যাণপুর জামে মসজিদের দিকে রওনা হলেন। আমরা মসজিদের কাছে পৌঁছনো মাত্রই মন্‌জু ভাই দৌড়ে এসে বললেন, আমি মসজিদের ভিতর আশ্রয় নিয়েছি, আপনারাও মসজিদের ভিতর আসেন। মসজিদের ভিতর যেয়ে দেখলাম, সে একটা লঙ্কাকাণ্ড! শতশত লোক মসজিদের ভিতর গিজগিজ করছে। জীবন বাঁচাতে তারা মসজিদের পবিত্র স্থানে ঠাঁই নিয়েছে। আধা ঘণ্টা পর আমরা নিশ্চিত হলাম বিহারি এবং ঘাতকের দল

কল্যাণপুর ছেড়ে চলে গেছে। বাবা বললেন, চল আমরা বাসডিপোতে যাই। সেখান থেকে কোনো একটা বাস ধরে আমরা কল্যাণপুরের বাইরে চলে যাব।

আমরা যখন বাসডিপোর দিকে রওনা হলাম তখন দেখলাম বহু আহত লোক বাসডিপোর পাশে কল্যাণপুর মেইন রোড দিয়ে মিরপুর রোডের দিকে কাফেলার মতো রওনা হয়েছে। অনেকের দেহ বিহারিদের ধারালো অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। ক্ষতগুলো থেকে ক্রমাগত খুন ঝরছিল। কেউ কেউ আবার বাঁচার আশায় ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়েও আহত হয়েছিল। পথে পথে দেখলাম অসংখ্য মানুষের গলা কাঁটা লাশ। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। শেলীদের বাসার সামনে এসে দেখি সিরাজ সাহেব (রেজা ভাইয়ের বাবা) শেলীদের বাসায় মরে পড়ে আছেন। শেলীদের বাসার বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নম্বর- ৮, রোড নম্বর- ০২। দরজার ফাঁক দিয়ে তার দু'টি পা দেখা যাচ্ছে। শুনেছি কল্যাণপুরের পরিস্থিতি অফিসে জানানোর জন্য তিনি শেলীদের বাসায় ফোন করতে এসে বিহারিদের হাতে মারা গেছেন। হঠাৎ দেখলাম ডাঃ হায়দার আলী ওনার সাদা বক্সওয়াগন গাড়িটা চালিয়ে দ্রুত কল্যাণপুর থেকে বের হয়ে গেলেন। ওনার সমস্ত কাপড়-চোপড় নোংরা ছিল। পরে শুনেছি বিহারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি ম্যানহোলের ভিতর পালিয়েছিলেন। বিহারিদের হাতে পড়লে ওনার নিস্তার ছিল না। কারণ উনি ছিলেন আওয়ামী লীগের বড় মাপের নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ সংগঠক। আমরা ডিপোর সামনে মিরপুর রোডের উপর আসার পর আজিম ভাই দৌড়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মন্‌জু তোরা সব চলে যাচ্ছিস। এদিকে আমার মহিউদ্দীন ভাই আহসান উল্লাহ দুলাভাইয়ের বাসার সামনে গলাকাঁটা অবস্থায় পড়ে আছে। এখনও মরেনি।

আগেই বলেছি বাবা ছিলেন তৎকালীন কল্যাণপুর ইপিআরটিসি বাসডিপোর স্টোর ইনচার্জ। তিনি আমাদের সাথে নিয়ে কল্যাণপুর বাসডিপোতে চলে আসলেন। ডিপোতে গিয়ে তিনি একটা বাস বের করার ব্যবস্থা করলেন। তখন বহু লোক আমাদের সাথে বাসে উঠে বসল। বাবা বাস ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন বাসটিকে কোথাও না থামিয়ে দ্রুত একটানা চালিয়ে যেতে। সকলেই উদ্বিগ্ন ও শোকাহত। স্বজন হারানোর শোকে অনেকে ক্রন্দনরত ছিল। শোকার্ত মানুষের আহাজারিতে সমস্ত পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল।

আহসান উল্লাহ চৌধুরীর স্ত্রীর দৃশ্যটি ছিল সবচে করুণ ও হৃদয়বিদারক। ওনার পরণের পুরো শাড়িটি ছিল স্বামীর (আহসান উল্লাহ চৌধুরী) রক্তে ভেজা। চাচীর ক্রন্দনে চোখের পানি কেউ ধরে রাখতে পারেনি। চাচীর সাথে ছোট ছোট ৫-৬টা শিশু-কিশোর সন্তান। সন্তানগুলোর

চোখ মুখ শুকনা ও ভয়ার্ত। কিছুক্ষণ আগেই ওদের উপর দিয়ে ভয়ানক তাণ্ডব বয়ে গেছে। তাদের চোখ মুখের অভিব্যক্তিতেই ফুটে উঠেছিল। তারা সকলেই পিতার নিষ্ঠুর গণহত্যা স্বচক্ষে দেখেছে। এই হৃদয়বান মানুষটি বহু বাঙালিকে বাঁচানোর জন্য তাঁর সুরক্ষিত বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অথচ এই মানুষটিকেই নির্মমভাবে ঘাতকের হাতে বলি হতে হয়েছে। চাচীর অনুরোধে বাবা আহসান উল্লাহ চাচার বিপদগ্রস্ত অসহায় পরিবারটিকে টিবি হাসপাতালের স্টাফ কোয়ার্টারের কাছে নামিয়ে দিলেন। বাবা পরিবারটির সাথে মন্‌জু ভাইকে দিয়ে দিলেন। মন্‌জু ভাই টিবি হাসপাতালের স্টাফ কোয়র্টারে ওনাদের এক নিকট আত্মীয়র বাসায় পৌঁছে দিয়ে সন্ধ্যায় কমলাপুরে আমাদের সাথে মিলিত হলেন।

মুর্তজা বশীর
বাংলাদেশ ১৯৭১
কালি ও কলম, ১৯৭২

আহসান উল্লাহ চাচাকে ২৮ এপ্রিলের ৩-৪ দিন আগে দেখেছিলাম বাড়ির সামনে বাগান নিড়াচ্ছেন। চাচাকে বলেছিলাম, 'চাচা সবাই ফ্যামিলি দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে আর আপনি এখনও ফ্যামিলি নিয়ে ঢাকা আছেন?' উত্তরে চাচা বলেছিলেন, 'ভাতিজা আমি যাব না। আমি স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে যাব।'এখন বাংলাদেশের পতাকা দেখলেই মনে হয় সবুজের মাঝে লাল সূর্যটা বোধ হয় চাচার রক্তে রঞ্জিত।

রেজাউল করিম শামীম (৫৯)

সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, চিত্র বাংলা, পিতা: অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, স্থায়ী ঠিকানা: ২১৩, শহীদ খাজা নিজামুদ্দিন রোড ঝাউতলা, কুমিল্লা। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ১০১, গালিব স্মরণী, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁ, ঢাকা-১২১৫, ৭ জুলাই, ২০১০।

রেজাউল করিম শামীম

এপ্রিল মাসের মাঝা মাঝি কুমিল্লা থেকে চলে এলাম ঢাকার

কল্যাণপুর, নানাবাড়িতে। নানা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার। এসে দেখি সেই বাড়িসহ আশপাশের অন্যান্য বাড়িতে মহিলা সদস্যদের কেউ নেই। প্রতিটি বাড়িতে কয়েকজন করে শুধু পুরুষ মানুষ রয়েছে। নানাবাড়িতেও একই অবস্থা। সে বাড়িতে আমার বড় খালু ডাঃ মোহাম্মদ হাসেম এবং একজন খালাতো ভাই আনসার রয়েছে। ২৭ এপ্রিল বিকালে ঐ এলাকার আরো ক'জন নানার বাড়িতে বেড়াতে এলেন। তাদের মধ্যে সেলিম ভাই, ফারুক ভাই এবং চলচ্চিত্র অভিনেতা বাবর ভাই প্রমুখ ছিলেন। মূলত তাদের মুখেই শুনতে পাই মিরপুরের বিহারি ও মিলিশিয়ারা কল্যাণপুর আক্রমণ করতে পারে। আমরা কেউ বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বের সাথে নিইনি।

তারপরও অনেকটা দুশ্চিন্তায় কেটেছে সেই রাত। পরদিন হৈ চৈ শুনে ঘুম ভাঙে। আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছে আনসার। সকলেই বলাবলি করছে মিরপুরের বিহারিরা তলোয়ার, রামদা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কল্যাণপুর আক্রমণ করেছে। তারা মিরপুর সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ এলাকা থেকে আমাদের বাড়ির পিছন দিক দিয়ে কল্যাণপুর ধেয়ে আসছে। আমরা ব্যাপারটি বুঝার জন্যে বাড়ির বাইরে গেলাম। আমরা তখনও গত রাতের পরিধেয় বস্ত্র– লুঙ্গি ও গেঞ্জি পড়ে পড়েছিলাম। মৃত্যু ভয়ে একই বসনে আমি আর আনসার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দেখলাম পরিচিত অনেকেই বাঁচার আশায় ছুটে পালাচ্ছে। পাইকপাড়ার দিকে কিছু দূর যেতেই দেখতে পেলাম তলোয়ার, রামদা, রড ও হকিস্টিক ইত্যাদি উঁচিয়ে একদল লোক হৈ-হুল্লোড় করতে করতে আমাদের দিকেই তেড়ে আসছে। অবস্থা বেগতিক দেখে আমি আর আনসার আমাদের বাসার দিকে ফিরে আসার জন্যে দৌড় দিলাম। দূর থেকে দেখলাম খালু আমাদের ফিরে যাওয়ার জন্য জানালা দিয়ে ইশারা করছেন। তখনো বুঝিনি, খালুর সঙ্গে এটাই আমাদের শেষ দেখা। দৌড়ে গেইট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢুকতে পারিনি। মেইন দরজার বাইরে তালা ঝুলানো। আগেই আমারা ঠিক করেছিলাম যে, মেইন দরজার বাইরে তালা ঝুলিয়ে ভিতরে সবাই থাকব– তাহলে পাকিস্তানি সেনা অথবা বিহারিরা মনে করবে বাড়িতে কেউ নেই। পিছনের অন্য আরেকটি দরজা দিয়ে সবাই আসা যাওয়া করব। কিন্তু আমরা দু'জনই যে ঐ ট্রাপে পড়ে যাব তা আগে বুঝিনি। অনেক ধাক্কাধাক্কির পরও ভিতর থেকে কারো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এদিকে বাইরের চিৎকার চেঁচামেচি ও খুনিদের হুংকার খুব কাছাকাছি চলে এল।

আমাদের বাড়ির বাউন্ডারির ভিতর থাকাটা আর নিরাপদ মনে হল না। অগত্যা আমরা দুইভাই দ্রুত দেয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে গেলাম। বাড়িটি ছিল টিনের চালাবিশিষ্ট। টিনের

চালাটি ছিল বাউন্ডারি দেয়ালের গা ঘেঁষা। আমরা দু'ভাই টিনের চালার নিচে ও বাউন্ডারি দেওয়ালে আড়ালে আশ্রয় নিলাম। উপর থেকে আমাদের দেখা যাওয়ার কথা না। এক অজানা শংকায় দুরুদুরু বক্ষে বসে আছি দু'জন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বাইরের চিৎকার কাছাকাছি চলে এল। মনে হল ঘাতকেরা আমাদের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। এরপরই কানে এল তালা আর দরজা ভাঙ্গার বিকট আওয়াজ। উর্দু কথাবার্তা চেঁচামেচি। 'একঠো মিলা। আওর দো আদমী কিধার।' আমরা যে বাড়ির টিনের চালার নিচে আশ্রয় নিয়েছি সে বাড়ির চালার উপর ক'জন বিহারি চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে উঠে পড়ল। নিচে আমরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলাম। মনে হল মৃত্যু দোরগোড়ায়। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বেশকিছু সময় পর চিৎকার চেচামেচি আস্তে আস্তে থেমে গেল। চারদিক তখন সুনসান, পিনপতন নীরবতা।

এ অবস্থায় আরো কিছু সময় যাওয়ার পর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে অনুযায়ী পুনরায় দেয়াল টপকে বাসার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে দরজা ভাঙা হয়েছে। হঠাৎ দেখলাম তোষকের নিচে কারো পায়ের উরু দেখা যাচ্ছে। অনেক ডাকাডাকির পর তিনি সাড়া দিলেন। তোষকের নিচ থেকে বেরিয়ে এলেন বাবর ভাই।

এবার তিনজন মিলে খালুকে খুঁজতে লাগলাম। কোনো রুমেই তাঁকে পাওয়া গেল না। তখন বাবর ভাই বললেন, তোষকের নিচ থেকে তিনি বিহারিদের কথাবার্তায় যেটুকু বুঝেছেন– তাতে মনে হয় খালুকে তারা ধরে নিয়ে গেছেন। এরপর বাবর ভাই আবার তোষকের নিচে ঢুকে পড়লেন। আমি আর আনসার পাশের কক্ষের স্টোর রুমের মালামাল সরিয়ে আসবাবপত্রের মধ্যে কোনোরকমে লুকিয়ে রইলাম।

আশ্রয়ের খোঁজে শরণার্থী

শহীদ ডাঃ মোহাম্মদ হাসেম

কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকার পর বাবর ভাই এসে আমাদের ডাকলেন। নতুন কোনো অজানা শঙ্কা নিয়ে আমরা স্টোর রুম থেকে বের হলাম। বাবর ভাই বললেন, ঘাতকরা এখন শুধু যাদের পেরেছে তাদের ধরে নিয়ে গেছে। কোনো কিছু লুট করেনি। তারা আবার লুট করার জন্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। সুতরাং, আমাদের ঘরের ভিতর আর বেশি সময় থাকা নিরাপদ নয়। আমাদের এখনই ঘর থেকে বাইরে কোথাও লুকাতে হবে। মুহূর্ত দেরি না করে আমরা তিনজনই বের হলাম ঘর থেকে। কিন্তু, কোথায় লুকাব আমরা? অবশেষে বাড়ির কাছেই একটি নতুন অব্যবহৃত লেট্রিনের ট্যাঙ্কের ঢাকনি খুলে এক এক করে ভিতরে ঢুকলাম। নতুন ট্যাঙ্কে চুন ও পানি দিয়ে রাখা হয়েছিল। তাতে পা চুলকাচ্ছিল। উঠছিল দুর্গন্ধময় গ্যাস। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়াও কষ্ট। ক্রমশ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর বাবর ভাই আবার বললেন, এখান থেকে বের হতে হবে। আমরা বের হলাম। ধীরে ধীরে প্রাচীরের বাইরে এলাম। হাঁটছি ধীরগতিতে। ধারে কাছে কোনো মানুষজন নেই। আমরা হাঁটছি কল্যাণপুর ডিপোর দিকে। সেখানে লোকজন আছে। তারা নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে। কিছুটা সামনে যেতেই আমরা 'থমকে দাঁড়ালাম। গলাকাটা রক্তাক্ত মানুষ পড়ে রয়েছে। ভয়ে-আতঙ্কে ভিতর থেকে চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। এরই মধ্যে আমরা দু'জন হয়ে গেছি। আমি আর আনসার। বাবর ভাই কোথায় যেন ছিটকে পড়েছেন। কোনো রকমে পড়ে থাকা হতভাগ্য রক্তাক্ত ব্যক্তিকে এড়িয়ে আর একটু সামনে যেতেই থমকে দাঁড়ালাম। সামনে দেখি একজন বৃদ্ধা মহিলা। সাদা চুল উসকোখুসকো। এলোমেলো শাড়ি। দেখে মনে হল বিহারি মহিলা। ভয়ে যে মুহূর্তে আমরা পিছন ফিরে পালাব ভাবছি তখনই বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বাবারা তোমরা আর সামনের দিকে যেয়ো না। সেখানে লাশ পড়ে আছে। তোমরাও লাশ হয়ে যাবে।'

আমরা কোথায় যাব ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। কোনো সড়ক পথে হাঁটা নিরাপদ মনে হল না। তাই আমরা উত্তরদিকে মাঠ-বিল-ধানক্ষেত পেড়িয়ে এগুতে থাকলাম। জিপটি থামল। আমাদের ভাগ্য ভালো। জিপের সামনের আসনে বসা সেনা কর্মকর্তাটি বাঙালি। বিমান বাহিনীর লোক। ইতোমধ্যে বাবর ভাই পুনরায় আমাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। ঐ সেনা কর্মকর্তাটির কাছে কল্যাণপুরের ঘটনা সংক্ষেপে বললাম। উত্তরে তিনি বললেন, এ ঘটনা আমিও শুনেছি। আপনাদের জন্যে আমার করার কিছু নেই। দেখুন আমার কাছে অস্ত্র পর্যন্ত নেই। আপনাদের জন্যে এটুকু শুধু বলতে পারি যে, আপনারা রাস্তা দিয়ে ফার্মগেইট চলে যান। তবে

তিনজন এক সাথে হাঁটবেন না। আলাদা হাঁটবেন। সামনে অবাঙালি আর্মি আছে। ঐ এলাকা পার হয়ে ফার্মগেইটে পৌঁছে গেলে আপনারা মোটামুটি নিরাপদ।

সেনা কর্মকর্তাটির উপদেশ অনুযায়ী আমরা সামনে পেছনে বিচ্ছিন্নভাবে হাঁটতে থাকলাম। ঢাকা শহরের রাস্তা দিয়ে ভেজা লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে চলেছি– একথা এখন ভাবা যায় না। সামনে একটা ইপিআরটিসি-র লাল বাস পেলাম। সেটাতেই চড়ে বসলাম। সেন্ট্রাল রোডের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর বাস থেকে নেমে গেলাম। তারপর পায়ে হেঁটে সোজা আমাদের মামার বাসায় গিয়ে উঠলাম। নানাবাড়ির পারিবারিক লোকজন ছাড়াও আরো অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ইতোমধ্যে ঐ বাড়িতে উঠেছেন। দেখা হল, আজকের খ্যাতিমান পরিবেশবিদ আমাদের মামা ড. আতিক রহমানসহ অন্যান্য অনেকের সাথে। তারা আগেই লোকমুখে কল্যাণপুরের পৈচাশিক সেই ঘটনার খবর পেয়েছিলেন। আমাদের জন্যে সকলেই ছিলেন উদ্‌গ্রীব। আমরাতো তবু জীবন নিয়ে ফিরেছি। কিন্তু ফিরতে পারেননি আমাদের খালু ডা. মোহাম্মদ হাশেম। পরে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে বর্তমান ১১ নম্বর রোডের মাথায় ধানক্ষেতের ঢালে গলা কাঁটা অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু পরদিন পরিবারের লোকজন লাশ আনতে যেয়ে সেখানে তাঁকে পাননি।

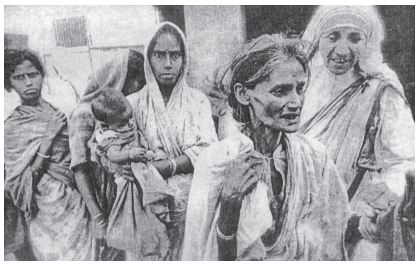

শরণার্থীদের মাঝে মাদার তেরেসা

এটিএম মনিরুল ইসলাম চৌধুরী (লিলু) (৬৬)

পিতা: তাইজুল ইসলাম চৌধুরী, ঠিকানা: বাড়ি নম্বর- ১৬, রোড নম্বর- ১৩, কল্যাণপুর, ঢাকা- ১২০৭। প্রাক্তন চিফ ফটোগ্রাফার, দৈনিক বাংলা, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: শহীদ আহসান উল্লাহ চৌধুরীর বাড়ি (রীতা ভিলা, বাড়ির নম্বর: ০২, রোড নম্বর: ১২, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭), ৮ আগস্ট, ২০১০

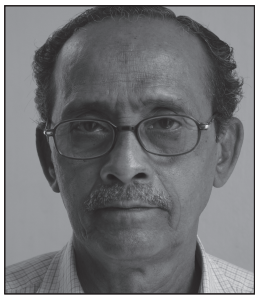

এটিএম মনিরুল ইসলাম চৌধুরী (লিলু)

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে আমার চাচা আহসান উল্লাহ চৌধুরী ছিলেন তৎকালীন ডেইলি পাকিস্তান অবজারভারের প্রেস ম্যানেজার। '৭১ সালে চাচার মাধ্যমে আমিও শিক্ষানবিশ হিসেবে পাকিস্তান অবজারভারে যোগদান করি। আমি চাচার কল্যাণপুরের বাড়ি ('রীতাভিলা', বাড়ির নম্বর-২, রোড নম্বর- ১২) থেকেই অফিসে যাতায়াত করতাম। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।

নিত্যদিনের মতো ২৮ এপ্রিল ভোরবেলা অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় আমার বন্ধু মুকুল একটি বিশালাকৃতির জিপগাড়ি নিয়ে আমাদের বাসায় হাজির। অনেকদিন পর বন্ধুর সাথে দেখা। তাই বেশ কিছুক্ষণ চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে সকালের নাস্তা খেতে বসলাম। এমন সময় আমাদের পাশের বাড়ির জালাল আহাম্মদ চৌধুরী সাহেবের পিয়ন আব্দুল আজিজ দৌড়ে ঘরে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমি অফিসে যাচ্ছিলাম, বাসডিপোর কাছে গিয়ে দেখি পাকিস্তানি আর্মিদের সাথে নিয়ে বিহারিরা রামদা, বল্লমসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আগুন দিতে দিতে কল্যাণপুর ঢুকছে। সামনে বাঙালি যাকে পাচ্ছে তাকেই নির্মমভাবে হত্যা করছে। আব্দুল আজিজের কথা শেষ হতে না হতেই দূর থেকে মানুষের হৈ হট্টগোল শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার চাচার বাড়িটিকে তুলনামূলক নিরাপদ আশ্রয় ভেবে আশপাশের লোকজন জড়ো হতে লাগল।

কী কারণে চাচার বাড়িটিকে অনেকেই নিরাপদ ভেবেছিল তা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। তখন কল্যাণপুরে হাতেগোনা কয়েকটি বাড়ি পাকা ছিল। তার ভিতর চাচার বাড়িটি ছিল একটি। সে কারণে এ বাড়িটি অনেকের কাছেই সুরক্ষিত মনে হয়েছিল। এছাড়া চাচা ছিলেন জনদরদী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। এলাকায় নানা প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয় ছিলেন। সুপরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হওয়াতে অনেকের ধারণা জন্মেছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও বিহারিদের হাত থেকে চাচা তাদের জীবন রক্ষা করতে পারবেন। তাই দলে দলে লোকজন চাচার বাসায় এসে জড়ো হতে লাগল।

চারদিকে মানুষের হৈ চৈ, আহাজারি, গগনবিদারী চিৎকার। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আমার কাছে ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। আমি উৎকণ্ঠিতভাবে চাচাকে বললাম, "কাকু চলেন, আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাই। আমার বন্ধুর জিপ গাড়িটা বেশ বড়, আমাদের সবার জায়গা হয়ে যাবে। তিনি বললেন, "এতো লোকজন আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, এদের ফেলে রেখে আমি কী করে যাই? আমি যাব না। তুই যা।" আমি হাল ছাড়লাম না, যাওয়ার জন্য বারবার চাচাকে বুঝাচ্ছিলাম। এক সময় চাচা বিরক্ত হয়ে ধমকের সুরে বললেন, আমি যাব না, তুই অফিসে

যাচ্ছিলি অফিসে যা।' এই বলেই এক রকম জোর করেই আমাকে বন্ধুর গাড়িতে তুলে দিলেন। গাড়িটি খালি পেয়ে বাঁচার আশায় আশেপাশের ১০-১২ জন লোক গাড়িতে উঠে বসল। এদের ভিতর বর্তমান ১২ নম্বর রোডের ইসলাম সাহেব (শফিকের বাবা) এবং জালাল সাহেবের পিয়ন আব্দুল আজিজ ছিল।

এখন প্রশ্ন দেখা দিল গাড়ি নিয়ে কল্যাণপুর থেকে বের হব কিভাবে? সেই সময় কল্যাণপুরের দক্ষিণ দিক দিয়ে বাসডিপোর পাশ দিয়ে বের হওয়ার একটাই মাত্র পথ ছিল। কিন্তু ঐ পথটিতে তখন পাকিস্তানি সেনা ও বিহারিরা যৌথভাবে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল। কল্যাণপুরের উত্তর দিকে সে সময় কোনো রাস্তাঘাট ছিল না। ছিল শুধু ধানক্ষেত আর জঙ্গল। আমার বন্ধু ধানক্ষেতের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে জিপ গাড়িটি চালিয়ে বাংলা কলেজের সামনে দিয়ে মেইন রোডে উঠল। আমরা টেকনিক্যাল হয়ে দারুস সালামে এসেই দেখি লঙ্কাকাণ্ড। হাজার হাজার বিহারি দা বল্লম এবং ধারালো অস্ত্রশস্ত্র উঁচিয়ে বাঙালিদের ধাওয়া করছে। বাঙালি পেলেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অথবা রাস্তায় ফেলে পশুর মতো জবাই করে হত্যা করছে। বাঙালি হত্যার আনন্দে তারা মাতোয়ারা।

উন্মত্ত বিহারি ও পাকিস্তানি সেনাদের হিংস্র ও বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য করে আমার বন্ধু মুকুল জিপের সকল আরোহীর উদ্দেশ্যে বলল, "আমি এখন দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে ধানমন্ডির দিকে যাব। আপনারা শক্তভাবে সিটে বসেন। দু-একজন গাড়ির নিচে পড়লেও আমি গাড়ি থামাব না। এমনকি আপনারা কেউ গাড়ি থেকে পড়ে গেলেও না।" যেমন কথা তেমন কাজ। একটা ঝাকুনি দিয়েই জিপটি ঝড়ের গতি লাভ করল। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের গাড়ির গতির তীব্রতা বাড়তে লাগল। সমস্ত কিছুকে পিছে ফেলে আমরা হাওয়ার গতিতে ছুটে চললাম।

দু'এক জায়গায় ঘাতকেরা গাড়ি থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তারা গাড়ির গতির কাছে ঘাতকরা হার মানল। কল্যাণপুর ডিপো অতিক্রম করার সময় দেখলাম ডিপোর পাশে বাঙালিদের টিনসেড ঘরবাড়ি এবং গরীব মানুষের ঝুপড়িগুলো আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা চলে এলাম ধানমন্ডি ছয় কিংবা সাত নম্বর রোডের ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসে। এখানেই আমার বন্ধু চাকরি করে। এতক্ষণ একটা ঘোরের ভিতর ছিলাম। খুনিদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর ঘোর কেটে গেল। রাস্তায় বিহারি ও পাকিস্তানি সেনাদের হিংস্র তাণ্ডব স্বচক্ষে দেখে চাচা, চাচী ও শিশু-কিশোর চাচাতো ভাই বোনদের দূরাবস্থার কথা ভেবে মন বিচলিত হয়ে উঠল। আমি প্রথমে অফিসে না গিয়ে আমাদের পত্রিকা ডেইলি পাকিস্তান অবজারভারের মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর বাসায় গেলাম।

হামিদুল হক চৌধুরীর কাছে কল্যাণপুরের রক্তাক্ত ও ভয়াবহ পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরলাম। ওনাকে আরো বললাম আমার চাচা আপনার পত্রিকার প্রেস ম্যানেজার আহসান উল্লাহ চৌধুরী তার পরিবারসহ মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের বিহারি ও পাকিস্তানি আর্মিদের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আটকা পড়েছেন। ওনাকে পরিবারসহ ঘাতকদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করলাম। সব শুনে হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব বললেন, 'আমি খবর নিচ্ছি। আশা করি ওনার কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি কাজে যাও। অফিসে আসার পর আমার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। ওনার সান্ত্বনার বাণী আমাকে কোনো স্বস্তি দিতে পারল না। চাচা, চাচী ও ছোট চাচাতো ভাই বোনদের জন্য আমার মন ছটফট করতে লাগল। চারটার দিকে খবর পেলাম আমার চাচা আর নাই। চাচার মৃত্যু সংবাদে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আমার চাচী এবং চাচাতো ভাইবোনদের কচি ও করুণ মুখগুলো একটার পর একটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। এক সময় আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলল।

এর মধ্যে খবর পেলাম কল্যাণপুরের কিছু ব্যক্তির সহায়তায় চাচী আমার চাচাতো ভাই-বোনদের সাথে নিয়ে মহাখালীর টিবি হাসপাতালের কলোনিতে চাচীর মামা মনির আহম্মদ চৌধুরীর কোয়ার্টারে আশ্রয় নিয়েছেন। মনির আহম্মদ চৌধুরী টিবি হাসপাতালে চাকরি করতেন। আমি কালক্ষেপণ না করে ঐ বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ঐ বাড়িতে পৌঁছে আমি চাচীর করুণ ও বীভৎস দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলাম। এমন দৃশ্য আমি আগে কল্পনাও করতে পারি নাই। চাচীর সমস্ত শরীর এবং শাড়ি চাচার রক্তে ভেজা। স্বামীর নির্মম মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে তিনি নির্বাক হয়ে গেছেন। শুধু তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুগঙ্গা বয়ে চলেছে। চাচীর পাশেই বসে ছিল তার ভীত বিহ্বল শিশু-কিশোর সন্তানেরা। তাদের পাংশু বর্ণ ও ভয়ার্ত মুখমণ্ডলের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। তারাও স্বচক্ষে দেখেছে পিতার পৈশাচিক ও করুণ মৃত্যুদৃশ্য। তাদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা কারো জানা ছিল না। চাচার রক্ত ভেজা শাড়িটি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে চাচী দীর্ঘদিন নিজের কাছে রেখেছিলেন। চাচার স্মৃতি মনে হলেই তিনি শাড়িটি বের করে দেখতেন আর মূর্ছা যেতেন। তাই এক সময় আমরা শাড়িটি লুকিয়ে ফেলি। এখনো '৭১ সালের ২৮ এপ্রিলের হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হলেই চাচার রক্তে ভেজা চাচীর শাড়িটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমাকে শিহরিত করে। আমি এক গভীর যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকি।

এসময় আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল কিভাবে চাচার লাশ কল্যাণপুর থেকে আনব। কারণ তখনও বিহারিরা মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে পাকিস্তানি সেনাদের সহায়তায়

বাঙালিদের উপর তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম *ডেইলি পাকিস্তান অবজারভারের* মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর সাহায্য নিব। এক মাত্র তিনিই পারেন এ কাজে সহায়তা করতে। কারণ তিনি ছিলেন পাকিস্তানপন্থী এবং পাকিস্তান জেনারেলদের সাথে ওনার বিশেষ সখ্যতা ছিল। তিনি আমার বাপ-চাচাদের খালাতো ভাই হওয়াতে ওনার কাছে এই সাহায্য চাওয়ার দাবিও আমাদের ছিল।

পরদিন ২৯ এপ্রিল ভোরবেলায় মনির আহম্মদ চৌধুরী (চাচীর মামা) ডাঃ শেখ হায়দার আলী (আমার চাচাতো বোনের স্বামী) টিবি হাসপাতালের একজন ডাক্তার এবং আমি প্রথমে হামিদুল হক চৌধুরীর বাসায় যাই। হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব বিশেষ ব্যবস্থায় আমাদের সাথে এক ট্রাক পাকিস্তানি সৈন্য পাঠালেন। পাকিস্তানি আর্মিরা আমাদের স্কট্ করে কল্যাণপুর নিয়ে আসল। সকাল ৯টার দিকে আমরা ডিপোর পাশ দিয়ে মিরপুর রোড থেকে কল্যাণপুর মেইন রোডে প্রবেশ করলাম। কল্যাণপুর মেইন রোডে ঢুকেই দেখলাম রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য বাঙালির লাশ পড়ে আছে। মনে হল এ যেন কারবালার প্রান্তর।

চাচার বাড়ির সামনে এসে দেখলাম, সিঁড়ির সামনে খালি প্লটে (ঠিকানা বাড়ি এবং চাচার বাড়ির মাঝখানে) উন্মুক্ত আকাশের নিচে জমাটবাঁধা রক্তের মধ্যে চাচার লাশটি অসহায়ভাবে পড়ে আছে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাতে ঘিলু বের হয়ে গিয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকের বা পাশের পাঁজর দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছে। চাচার লাশের পাশে আরো কয়েকটি লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তাদেরকেও নিষ্ঠুর ও দানবীয় কায়দায় হত্যা করা হয়েছে। কোনো লাশ উপুড় হয়ে আছে, আবার কোনো লাশ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কাউকে জবাই করে ধর থেকে মাথা আলাদা করে ফেলা হয়েছে। কারো হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। কারো ঘাড় মটকানো। কারো আবার মাথা থেত্লে দেওয়া হয়েছে। এদের বেশিরভাগই আমার অপরিচিত। সম্ভবত এরা পাইকপাড়া, আহম্মদনগর, টেকনিক্যালসহ আশেপাশের এলাকা থেকে ধাওয়া খেয়ে কল্যাণপুরে চাচার বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল।

বীভৎস দৃশ্য, বেশিক্ষণ দেখা যায় না, আমার চাচার লাশটি আমরা কয়েকজন ধরাধরি করে গাড়িতে উঠালাম। এরপর আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরের অবস্থা দেখার জন্য। ঢুকেই আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল কোনো এক মৃত্যুপুরীতে ঢুকে পড়েছি। বাড়ির ভিতর প্রতিটি রুমেই নানা বয়সী অসংখ্য মানুষের লাশ পড়ে আছে। বেশিরভাগ মানুষকেই কসাইখানার গরুর মতো জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। সবগুলো রুমের মেঝে মানুষের রক্তে

ভেসে গিয়েছে। রক্ত এখন জমাট বেঁধে গেছে। জমাট বাঁধা রক্তের নিচে শরীর ডুবে আছে, শুধু মুখমণ্ডলের কিছু অংশ জেগে আছে। এসব লাশের ভিতর– একটি দেহ দেখে মনে হল এখনও বেঁচে আছে। মাথায় ধারালো অস্ত্রের মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন। মনে হল দেহটি একটু একটু নড়ছে। আমি ডাক্তার হায়দার আলীকে বললাম, 'হায়দার ভাই লোকটা বোধহয় এখনও বেঁচে আছে।' হায়দার ভাই দেখেই বললেন, হ্যাঁ লোকটা তো জীবিত। চলেন আমরা গাড়িতে উঠাই। কিন্তু গাড়িতে আহত ব্যক্তির দেহটি উঠাতে গিয়ে পাকিস্তানি আর্মিদের বাঁধার সম্মুখীন হই। আমাদের সাথে আসা পাকিস্তানি আর্মিরা বলল, 'একটি লাশ নেবার অর্ডার আছে, এর বেশি নেয়া যাবে না।' পরে আমাদের সকলের অনুরোধ ও জোরাজুরিতে তারা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে গাড়িতে উঠাতে বাধ্য হয়। প্রথমে আমরা গাড়িটি নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই। সেখানে আহত লোকটিকে ভর্তি করানো হল। ডাক্তার হায়দার আলী আহত লোকটির সাথে ঢাকা মেডিকেলে থেকে গেলেন। আহত ব্যক্তিটি ছিলেন ডাঃ হাবিবুল্লাহর বাবা ইসমাইল মিয়া ঠিকানা- 'চন্দ্রিমা', ৭১, কল্যাণপুর মেইন রোড। আমি আমার চাচার লাশ গোসল এবং জানাজা দিয়ে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করার ব্যবস্থা করলাম।

এরপর দীর্ঘদিন আর কল্যাণপুর আসি নাই। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে একবার চাচার বাড়িটি দেখার জন্য কল্যাণপুর আসি। এসে দেখি সে এক বিরাণ ভূমি। সমস্ত এলাকা জুড়ে বড় বড় ঘাস এবং ঝোপ-জঙ্গলে ভরে গেছে। ২৮ এপ্রিল গণহত্যার পর যারা এলাকা ছেড়েছে, তারা আর ফিরে আসেনি। মনে হচ্ছিল জনমানবহীন পরিত্যক্ত একটি এলাকা। বাসায় গিয়ে দেখি লাশগুলো পচে গলে শুধু কঙ্কালগুলো পড়ে আছে। আর দেহের পচাগলা বস্তুগুলো শুকিয়ে ছোট ছোট শক্ত বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সবগুলো রুমের ভিতর সাদা পোকা কিলবিল করছে। কিছুদিন পর আমার অফিসের বিহারি মেশিনম্যানকে নিয়ে আবার কল্যাণপুর চাচার বাড়িতে আসলাম। সাথে আরো ১০-১২ জন লেবার নিলাম। উদ্দেশ্য চাচার বাড়িটি পরিষ্কার করা। আগেই বলেছি কল্যাণপুর বিগত কয়েক মাসে ঝোপ-জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল। প্রথমে কঙ্কালগুলো ঐসব ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর ফেলে দিলাম। তারপর জালাল সাহেবের পুকুর থেকে পানি এনে ঘরগুলো পরিষ্কার করলাম। চাচী এখনও চাচার দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছেন। চাচার কথা মনে হলে এখনও তিনি নীরবে অশ্রু মোচন করেন। কখনও কখনও মূর্ছাও যান।

জেসমিন সিরাজী (৫২)

চিত্রশিল্পী, পিতা: সিরাজুল হক চৌধুরী, ঠিকানা: মেলোডি হাউজ, বাড়ি নম্বর: ১১, রোড নম্বর: ০২, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২২ ডিসেম্বর ২০১০

জেসমিন সিরাজী

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিলাম। বয়স ছিল ৭ বছর। ছোট থাকলেও বাবার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে স্মৃতি এখনও দৃশ্যপটে ভাসে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালি নিধন শুরু হলে প্রতিদিনই আমরা কোনো-না-কোনো লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের খবর শুনতাম। কল্যাণপুরে অনেক পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে যায়। আমরা যারা যেতে পারি নি, তারা প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত আতঙ্কের মধ্যে বাস করতাম। সে সময়ের বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা এখনও ভুলতে পারি না। বিশেষ করে আমার বাবার বীভৎস মৃত্যুদৃশ্য মনে পড়লে গা ছমছম করে উঠে।

সে সময় কল্যাণপুরে হাতে গোনা কয়েকটি পাকা বাড়ির ভিতর আমাদের বাড়িটি ছিল একটি। আমাদের বাড়ির নাম ছিল মেলোডি হাউস। বিহারিরা আমাদের বাড়ির কাছাকাছি চলে এলে বাবা টেলিফোনে কোথাও যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিহারিরা আমাদের টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে। নিরুপায় হয়ে বাবা টেলিফোন করার জন্য রুহুল আমিন চাচার বাড়িতে রওনা হলেন। রুহুল আমিন চাচা এবং আমাদের বাড়ির কল্যাণপুর ২ নং রোডে অবস্থিত। আমাদের বাড়ির নম্বর ১১ আর রুহুল আমিন চাচার বাড়ির নম্বর ৮। বাবা রুহুল আমিন চাচার বাড়ির সামনে গিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় বিহারিরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলি তাঁর পায়ে লাগে। সে সময় রুহুল আমিন চাচার বাসায় ওনার ভাতিজা টিপু ও গাড়ির ড্রাইভার ছিল। বাবা কড়া নেড়ে দরজা খুলে দেবার কথা বললে ওরা দরজা খুলে দেয়। বিহারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাবা তাদের লুকাতে বলে। তারা খাটের নিচে লুকিয়ে পড়ে। এ সময় বিহারিরা

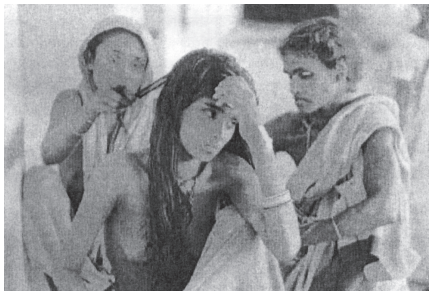

শরণার্থী

বাঙালিদের উর্দুতে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে করতে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। বাবাকে মারতে উদ্যত হলে বাবা ওদের অনুনয় করে বলতে থাকে আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও। আমি মেয়েদের শেষবারের মত একবার দেখে আসি। ওরা উর্দুতে বাবাকে বলে আমরা তোর বাসার সবাইকে খুন করে এসেছি। এ সময় একজন বিহারি করাতের মতো একটা ছুরি বাবার পেটে ঢুকিয়ে দেয়। এরপর কয়েকজন মিলে বাবাকে মেঝের উপর চিৎ করে ফেলে দিয়ে একজন বুকের উপর চড়ে বসে। এরপর কোরবানীর গরুর মতো জবাই করে মাথা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে। মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘাতকেরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। রুমের দেয়াল এবং মেঝে রক্তে ভেসে যায়। খাটের নিচ থেকে টিপু এবং ড্রাইভার বাবার হত্যা দৃশ্য দেখতে পায়। পরে তারা আমদের কাছে বাবার বিভৎস হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেয়। বিহারিরা চলে গেলে রেজা ভাই (আমদের সবার বড় এবং একমাত্র ভাই) বাবার খোঁজে রুহুল আমিন চাচার বাসায় গিয়ে বাবার বীভৎস লাশ দেখে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় পাকিস্তানি সেনারা রুমের ভিতর ঢুকে ভাইয়ের পিঠে অস্ত্র ঠেকিয়ে উর্দুতে বলে তুমি মুক্তিযোদ্ধা? ভাই বলে আমি মুক্তিযোদ্ধা নই। লাশ দেখিয়ে বলে– এ লাশ আমার বাবার। পাকিস্তানি সেনারা বিশ্বাস করে না। বলে তোমার বাসা কোথায়? তোমার বাসায় আমাদের নিয়ে চল। বাসায় নিয়ে যাবার সময় ভাই পাকিস্তানি সেনাদের অনুরোধ করেছিল, তারা যেন বাড়িতে বাবার মৃত্যু সংবাদ না দেয়। পাকিস্তানি সেনারা ভাইকে নিয়ে বাড়িতে আসলে মা বলে ও আমার ছেলে। ও মুক্তিযোদ্ধা নয়। ওকে ছেড়ে দাও। পরে ওরা ভাইকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। বিকালে পাকিস্তানি সেনারা কল্যাণপুরে প্রতিটি অলিগলিতে পাহারা বসায়। বাবার মৃত্যু খবর পেয়ে আমার চাচা এসে বিকেলে আমাদের কল্যাণপুর থেকে নিয়ে যান। যাবার সময় আমার বাবার বীভৎস লাশ দেখে আমরা সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। কী নির্মম! কী নিষ্ঠুর সেই দৃশ্য ভুলে থাকা যায় না।

পরদিন আর্মি হেডকোয়ার্টারের অনুমতি নিয়ে আমার চাচা, ভাই ও আত্মীয়-স্বজন বাবার লাশ কল্যাণপুর থেকে নিয়ে যান। আজিমপুরে বাবার লাশ দাফন করা হয়। কল্যাণপুর ছেড়ে আমরা চলে যাবার পর রাজাকাররা আমাদের বাড়ি দখল করে ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে।

বাবার সেই করুণ মৃত্যু দৃশ্য দেখার পর থেকে ভয়ে টিপু আস্তে আস্তে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কিছুদিন আগে টিপুর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। এখনও সে অপ্রকৃতস্থ। একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি এখনও তাকে তাড়া করে ফিরে।

স. ইসলাম মঞ্জু (৫৮)

স. ইসলাম মঞ্জু

সুপাভাইজার, বেক্সিমকো ফার্মা, পিতা: বজলুল হক, ঠিকানা: ৩৬৪/২, উত্তর পীরেরবাগ, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর, ২০১০

'৭১-এর ২৫ মার্চ হানাদারদের আক্রমণের পর থেকেই কল্যাণপুরের লোকজন ভীত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে পরিবার পরিজন নিয়ে দেশের বাড়ি অথবা কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া শুরু করে। যদিও নিরাপদ জায়গা বলতে আসলে তখন কিছুই ছিল না। তবুও মানুষ যাচ্ছে। আমরা তিন ভাই আর আমার মা-বাবা, এই ছিল আমাদের পরিবার। ইপিআরটিসিতে বাবা চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন কল্যাণপুর ডিপোর স্টোর ইনচার্জ। সেই সুবাদে আমরাও কল্যাণপুর ভাড়া বাসায় থাকতাম।

২৮ এপ্রিল সকালে মানুষের কোলাহল ও গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভাংগে। মানুষের আত্মচিৎকারে ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। বাবুকে বললাম আমি ঘরে গিয়ে রেডি হচ্ছি, তুই রেডি হ। এখান থেকে পালাব। আমাদের ঘর আর ওদের ঘর খুব কাছাকাছি। আমি ঘরে ঢুকতেই আব্বা বকা দিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নে। মনে হয় বিহারিরা কল্যাণপুর আক্রমণ করেছে। এর মধ্যে বাবু আমাদের ঘরের পিছন দিক দিয়ে দৌড়ে চলে যেতে যেতে বল্লো মঞ্জু যেদিকে পারিস পালা। বিহারিরা কল্যাণপুর আক্রমণ করেছে। আমি ওকে চিৎকার করে ডাকলাম বাবু বাবু দাঁড়া দাঁড়া। কিন্তু আমার ডাক চারদিকের চিৎকার কোলাহল আর কান্নার আওয়াজে হারিয়ে গেল। আর ওটাই ছিল ওর সাথে আমার শেষ কথা। তারপর আজ অবধি এই চল্লিশ বছরেও ওর দেখা পাইনি। পায়নি ওর বাবা মাও। হয়তো আর কোনোদিন পাওয়াও যাবে না।

নির্যাতিত

আব্বা বললেন চল তাড়াতাড়ি। ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমে কিছুই চেখে পড়ল না। আমরা ধীরে ধীরে চেষ্টা করছি লুকায়ে

লুকায়ে কোনো একটা নিরাপদ আশ্রয় বের করতে। কারণ তখন বিহারি আর হানাদার বাহিনী কল্যাণপুর ঘিরে ফেলেছে, বের হবার সব রাস্তাই বন্ধ।

বিহারিরা প্রায় প্রতিটি ঘরে আগুন দেয়। ঘর থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ বের হওয়ার সাথে সাথেই বিহারিরা গরু জবাই করার ছুরি দিয়ে সবাইকে জবাই করতে লাগল। এ বীভৎস্য দৃশ্য দেখে আমাদের তখন আতঙ্কে পাগল হওয়ার অবস্থা। এর মধ্যে আমার শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে খুব বেড়ে গেল। হাঁটতেও পারছিলাম না। আব্বা আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে অধ্যাপক মফিজুর রহমান স্যার এর বাসায় ঢুকলেন। কল্যাণপুরে যে কয়টা পাকা বাড়ি ছিল স্যারের বাড়িটি ছিল তার একটি। বাড়িটির দোতালায় কাজ তখন প্রায় শেষ। ছাদের উপর ছিল স্যারের লাউয়ের মাচা। আমরা তিনজন সেই মাচার নিচে আশ্রয় নিলাম। আমার বোধ শক্তি তখন শূন্যের কোঠায়। প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছি কখন মৃত্যু আসে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, ত্রিশ মিনিট। সময় যেনো এক জায়গায় থমকে আছে । আর পারছি না। শরীর পুড়ে যাচ্ছে। মাথা শূন্য মনে হচ্ছে।

লাউয়ের মাচা থেকে বেরিয়ে এলাম। একা। আব্বা কোনোকিছু বলার আগেই বাড়িটি করার জন্য যে লম্বা লম্বা বাঁশ লাগান ছিল তা ধরে নিচে সোজা রাস্তায় নেমে এলাম। পিছন ফিরতেই দেখি পাঁচ-ছয় জন লোক। কেউ লুঙ্গি পরা আর কেউ পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা। আমাকে দেখছে। হয়তো নামার পুরো সময়টাই দেখেছে। ওরা কারা? এতটা স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন? হাতে ওটা কী? আবার লুঙ্গির ফাঁকে লুকাচ্ছে কী? আমি আকুল হয়ে বললাম, ভাই সামনে কি বিহারি আছে? ওদের একজনকে কেন যেনো আমার চেনা মনে হচ্ছিল। বয়স হয়তো বিশ-বাইশ হবে। কমবেশিও হতে পারে। ওরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর ওরা নিজেরা যেন কী বলাবলি করল। যাকে খুব চেনা মনে হচ্ছিল সে যেনো ওদের কী বলল। তারপর একজন খুব কর্কশ গলায় বলল "ভাগো ইহাসে"। কিন্তু কোনদিকে যাব আমি? ওরা বিহারি। মানুষ মেরে এসেছে। হয়তো লুঙ্গির নিচে লুকায়ে রেখেছে কোন রক্ত মাখা ছোরা। কিন্তু কেন লুকিয়েছে। আমাকে ওরা মেরে ফেলতে পারে অনায়াসেই। আমি নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে আছি। চেনা লোকটি এবার আমার খুব কাছে এসে আস্তে আস্তে খুব পরিষ্কার বাংলায় বলল দৌড় দিয়ে সামনের মসজিদে ঢুকে পড়ো। জানতে পেরেছিলাম এই লোকটি কল্যাণপুরের সেলুনে কাজ করতো। বিহারি, কিন্তু আমাদের এলাকার ক্ষৌরকারের কাজ করায় সে আমাদের সবাইকে চিনতো। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে মসজিদের বন্ধ দরজায় আঘাত করলাম। দরজাটা খুলুন। দয়া করে দরজাটা খুলুন ভাই প্লিজ। কে যেনো দরজা খুলে আমাকে ভিতরে টেনে নিল। ভিতরে প্রায়

ত্রিশ-চল্লিশ জন আতঙ্কিত মানুষ। এই দিকে আমার আব্বা আর ভাই কোথায় পড়ে রইল কে জানে। প্রায় দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টার পর কেউ একজন মসজিদের দরজা ধাক্কা দিয়ে বলল সবাই বাইরে আসুন বিহারিরা চলে গেছে। বের হতে ভয় হচ্ছিল। কিন্তু একজন বাইরের মানুষটির গলা চিনতে পারল। দরজা খুলে বের হয়ে আসলাম সবাই। বাইরেও বেশকিছু লোক, আমার আব্বা আর ভাইকেও পেলাম ওদের মধ্যে। ওদের মধ্যে একজন বলল সবাই ডিপোর সামনে চলেন। ওখান থেকে একটা বাস বের করে আমরা এই মৃত্যুপুরী থেকে বের হয়ে যাই। তারপর যা থাকে কপালে। সবাই ডিপোর সামনে এসে জড়ো হলাম। তখন মিরপুর রোড এখনকার মতো প্রশস্ত রাস্তা তখন ছিল না। খুব বেশি হলে ত্রিশ ফুট একটা রাস্তা। আমরা দাঁড়াতেই ভিতর থেকে একটা বাস এসে থামল। বাসে উঠব এমন সময় আমার আরেক বন্ধু আজিম দৌড়ে এসে বলল মঞ্জু দোস্ত আমার বোবা ভাইটাকে ওরা জবাই করে ফেলেছে। পেট কেটে ফেলেছে। কিন্তু এখনও বেঁচে আছে। আমাকে সাহায্য কর। চল ওকে নিয়ে আসি। আজিম যে কল্যাণপুরে ছিল আমরা এর আগে জানতে পারিনি। কিন্তু এখন ওই মৃত্যুপুরীতে কে ঢুকবে? যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক জবাই করা লাশ। এদিকে এই বাসও আটকানো যাচ্ছে না। সবাই প্রাণভয়ে এতটাই ভীত যে কারো কষ্ট দেখার বা শোনার মতো মনের অবস্থা নেই। এমন সময় বিকট সাইরেন বাজাতে বাজাতে একটি এ্যাম্বুলেন্স এসে থামল। দুই তিন জন ভদ্রলোক। মনে হয় ডাক্তার। আমাদেরকে বললেন আমরা রেডক্রস থেকে এসেছি। আপনাদের এখানে ডাঃ হায়দার নামে কেউ আছেন? আমরা তাকে নিতে এসেছি। এ ডাঃ হায়দার আলীকে আমরা সবাই চিনতাম। আমার ছোট ভাই জিন্নাহ বলল ডাঃ হায়দার আলী কল্যাণপুর থেকে কিছুক্ষণ আগে একটি ভক্সওয়াগন গাড়ি চালিয়ে বের হয়ে গেছেন। আমরা নিজ চোখে দেখেছি। তবে ভিতরে অনেক আহত লোক আছে। আপনারা সেই মানুষগুলোকে বাঁচান। আজিম বলল দোস্ত চল এই সুযোগে ভাইকে নিয়ে আসি। কিন্তু মেইন রোড থেকে আজিমদের বাড়ি অনেক ভিতরে ১২ নং রোডে। রেডক্রসের লোকগুলো বলল আপনারা আহতদের এনে দিতে পারলে আমরা নিয়ে যাব। আব্বা বললেন মঞ্জু ওর সাথে যা। আল্লাই তোদেরর রক্ষা করবে। কিন্তু আমরা ছোট দুইজন মানুষ এতো দূর থেকে একজন বড় মানুষকে কিভাবে আনব? এর মধ্যে আরো দু-তিনজন বয়স্ক মানুষ বলল চল তোমাদের সাথে আমরাও যাব। বাসের অন্যান্য আরোহী আমাদের আশ্বাস দিল তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা বাস নিয়ে অপেক্ষা করব। যেহেতু রেডক্রসের একটি এ্যাম্বুলেন্স আছে অন্ততপক্ষে এখন ওরা আর কিছু করতে সাহস করবে না। আমরা এই চার পাঁচজন তখন মৃত্যুপুরীতে ঢুকে পড়লাম। যেতে যেতে দেখলাম সব বীভৎস দৃশ্য। বেশির ভাগ মানুষকে তারা গলা কেটে হত্যা করেছে।

কাটা গলা ভয়ঙ্কর ভাবে ফাঁক হয়ে আছে। রক্ত শুকিয়ে গেছে। সাদা চর্বি রোদের আলোতে চিক চিক করছে। আমরা অনুভূতিহীনভাবে এসব দেখতে দেখতে আজিমদের বাড়ির কাছে এলাম? ওদের বাড়িটা তখনও আগুনে পুড়ছিল। হঠাৎ আহসান উল্লাহ চাচার বাড়ির খোলা বারান্দার দিকে তাকিয়ে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঘরের সিঁড়ি আর মেঝের উপর অবহেলায় পড়ে আছে আহসান উল্লাহ চাচার গলার কাঁটা লাশ। অংশটুকু বিশ্রীভাবে ফাঁক হয়ে আছে। আর অনতি দূরে পড়ে আছে আমার বন্ধু আজিমের মৃতপ্রায় বাকপ্রতিবন্ধি মহিউদ্দিন ভাই। আমি একটা মাফলার কুড়িয়ে নিয়ে মহিউদ্দিন ভাইয়ের গলাটা পেঁচিয়ে দিলাম যেনো মাথা নড়াচড়া করতে না পারে। অন্য সময় হলে একাজটা করতে পারতাম না। তারপর সবাই ধরাধরি করে রওনা দিলাম। রক্তে আমার জামা ভিজে যাচ্ছে। মনে মনে সবাই ভাবছি রাস্তায় গিয়ে গাড়িগুলো পাব তো। মেইন রোডে এসে দেখলা গাড়িগুলো আগের জায়গাতেই আছে। আমাদেরকে দেখে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আহত মহিউদ্দিন ভাইকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিলাম। সাথে গেল আজিম। এ্যাম্বুলেন্স থেকে একজন বলল আপনারা বাস নিয়ে আমাদের পিছন পিছন আসুন। কারণ আজ সকাল বেলায় বাঙালিরা ইপিআরটিসি বাসে চড়ে কল্যাণপুর ছেড়ে পালাচ্ছিল। বিহারিরা শ্যামলীতে বাসটি আটক করে একে একে সবাইকে জবাই করে হত্যা করেছে। আমাদের সাথে চললেন আহসান উল্লাহ চাচার ভাবলেশহীন স্ত্রী আর তাঁর নাবালক ৫টি ছেলেমেয়ে। সকলের শরীর রক্তে মাখামাখি। প্রচণ্ড আর ভীতিকর শব্দে সাইরেন বাজিয়ে এ্যাম্বুলেন্স রওনা দিল আর আমরা ৫০-৬০ জন মানুষ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এ্যাম্বুলেন্সের পিছন পিছন যাচ্ছি। পিছনে পড়ে রইল এক রক্তাক্ত প্রান্তর আর এদেশের সোনার মানুষের রক্তেভেজা অভিশপ্ত কল্যাণপুর।

সংরক্ষণ প্রয়াস ও বর্তমান অবস্থা

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য কল্যাণপুর গণহত্যায় শহীদদের মর্যাদা দিয়ে সার্টিফিকেট এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি পরিবারকে ২ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। সার্টিফিকেটগুলো বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষর সম্বলিত ছিল।

পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কল্যাণপুরের শহীদদের কেউ আর স্মরণ করেনি। রাষ্ট্রীয়ভাবে তো দূরের কথা কোনো সামাজিক সংগঠনও কল্যাণপুর গণহত্যা দিবসটি পালন করেনি। শুধু পরিবারের সদস্যরা এই দিবসটিতে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে তাদের প্রিয়জনকে স্মরণ করতো এবং নিরবে চোখের জল ফেলতো।

এরপর অনুশীলন সংসদ কল্যাণপুরের শহীদদের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য এগিয়ে আসে। সংগঠনটি ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে 'শহীদ স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটি' নামে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে।

অনুশীলন সংসদ ও উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে স্বাধীনতার ২৯ বছর পর ২০১০ সালে ২৮ এপ্রিল প্রথম কল্যাণপুর গণহত্যা দিবসটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ও অনুশীলন সংসদ প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে দিবসটি পালনের ফলে নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কল্যাণপুরে মিরপুর রোডের উপর যেখানে হত্যা করা হতো, সেখানে এবং প্রতিটি শহীদের বাড়ির সামনে স্মৃতিফলক নির্মাণ করতে পারলে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের ইতিহাস জানতে পারবে।

মূল্যায়ন

২৮ এপ্রিল বিহারিরা স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত ও মুসলিম লীগের কিছু কর্মী ও সমর্থকদের সহযোগিতায় কল্যাণপুরের গণহত্যা চালায়। পাকিস্তানি সেনারা বিহারিদের হত্যাকাণ্ডে উৎসাহ যোগায়। বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে কল্যাণপুর গণহত্যা একটি বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। প্রকৃতপক্ষে এই গণহত্যার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল আরো গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

কল্যাণপুর গণহত্যার ইতিহাস সরকারি কোনো নথিপত্রে সংকলিত হয়নি। এছাড়াও স্বাধীনতার পর কল্যাণপুর দ্রুত নগরায়ন হয়। বর্তমানে ৯৫% অধিবাসীই স্বাধীনতার পর এখানে বসতি স্থাপন করেছে। সঙ্গত কারণে কল্যাণপুরের গণহত্যার ইতিহাস তাদের জানার কথা নয়। তাই শহীদ পরিবার ও কল্যাণপুরের সচেতন মহল চায় কল্যাণপুরের গণহত্যার ইতিহাস স্বাধীনতার দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ করা হোক। শহীদদের বীরত্বপূর্ণ আত্মাহুতিকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখার জন্য দু'টি দাবি শহীদ পরিবারগুলো দীর্ঘদিন করে আসছে। ১. শহীদদের নামে কল্যাণপুরের রাস্তাগুলোর নামকরণ করা। ২. শহীদদের নামযুক্ত স্মৃতিফলক কল্যাণপুরের শহীদ মিনারের পাশে স্থাপন করা।

তথ্যপঞ্জি

আব্দুল করিম (৫৫), পেশা- পুস্তক ব্যবসায়ী, পিতা- আব্দুর রহমান, ঠিকানা: ১৩ মধ্য পাইকপাড়া, ঢাকা-১২১৬, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: লেখকের বাড়ি (ঝিঙেফুল, ৬৭ কল্যাণপুর প্রধান সড়ক, ঢাকা-১২০৭), ৭ জুলাই, ২০১০।

জেসমিন সিরাজী (৫০), পেশা- চিত্রশিল্পী, পিতা- সিরাজুল হক চৌধুরী, ঠিকানা: মেলোডি হাউজ, বাড়ি নম্বর-১১, সড়ক নম্বর-২, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ- কল্যাণপুরের পৈত্রিক বাড়ি, ২২ ডিসেম্বর, ২০১০।

নাজনী আহমেদ (৫৯), পেশা- গৃহিণী, পিতা- শহীদ এ.আই.এম আলাউদ্দিন, ঠিকানা: বাড়ি নম্বর- ৮, সড়ক নম্বর-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ- নিজ বাড়ি, ১১ জানুয়ারি, ২০১০।

স. ইসলাম মঞ্জু (৫৮), পেশা- সুপারভাইজার, বেক্সিমকো ফার্মা, পিতা- বজলুল হক, ঠিকানা: ৩৬৪/২ উত্তর পীরেরবাগ, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ- নিজ বাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর, ২০১০।

ঋণ স্বীকার

১. কল্যাণপুর অনুশীলন সংসদ, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭।

২. উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, কল্যাণপুর শাখা, ঢাকা-১২০৭।

৩. অধ্যাপক ফজলুল হক সরকার, প্রাক্তন উপ-পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঠিকানা: মনিকা মহল, ৫ শহীদ মিনার সড়ক, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭।

৪. গিয়াস উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা, ১০ নম্বর সেকশন, পিতা- কুতুব উদ্দিন আহমেদ, ঠিকানা: বাড়ি নম্বর- ৬, সেক্টর-৬, ব্লক- বি, সড়ক- ৩, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

৫. সাইয়েদ বদরুল করিম রতন, পিতা- মোঃ ফজলুল করিম, মাতা- সাইয়িদা খাতুন, ঠিকানা : বাড়ি- ১, রোড-৭, ব্লক- ই, সেকশন- ১, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।

৬. অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান ('৭০ সালে মিরপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন), পিতা- ডাঃ মোঃ জহুরুল হক

৭. রেজাউল করিম বাবলু (জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড়), পিতা- আবুল কাশেম, ঠিকানা: বাড়ি নম্বর- ১০, সড়ক নম্বর- ৮, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭।

৮. মোস্তাক আহমেদ, পিত- এজাহারুল হক চৌধুরী, ইকো সোসাইটি (প্রাঃ) লিমিটেড, ঠিকানা: বাড়ি নম্বর-৩৯, সড়ক নম্বর- ৪, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।

৯. তাছিরুন্নেছা, পিতা- শহীদ সামছুদ্দিন আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।